সুখের দরজা

সুজাতা

স্বরলিপি
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৫২

প্রকাশক : ধীরা চৌধুরী
স্বরলিপি
২৩এ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

মুদ্রক : প্রভাসচন্দ্র অধিকারী
স্বপ্না প্রেস
৩৫/২/১এ, বিডন স্ট্রীট
কলকাতা-৬

তরুণকে

বৃষ্টির জোর যদিও কমে এসেছিল, কিন্তু ঝিরঝির জলের ধারা তখনও থামেনি, থামেনি ঠাণ্ডা হাওয়ার এলোমেলো দাপট।

জানলার গরাদে মাথা ঠেকিয়ে মানসী জলে ভেজা বাইরের সবুজ ঘাসের ফালির দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ।

রাস্তাটা ভেজা ভেজা, ছায়া ছায়া। কিন্তু শম্ভুদার ছায়ামাত্রও কোথাও নেই।

জানলার পাশে দাঁড়িয়েই একটু হেলে টেবিলে রাখা বাবার পুরোন টাইমপিসের দিকে তাকাল মানসী। সাতটা বেজে দশ। পার্ক স্ট্রীটে পৌঁছবার কথা ঠিক সাতটার সময়। শম্ভুদা এখনও এলো না। তার মানে আজ কি আর ও আসবেই না?

বাঃ। বেশ হয় তাহলে। খুব ভালো হয়। বেশ খুশী খুশী লাগছে ভাবতে যে এই জলভেজা জলজল সন্ধ্যাটা আজ ওর নিজের। আজ সন্ধ্যাটা ও একা এমনি জানলার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাটিয়ে দিতে পারে মেঘ দেখে দেখে।

এই বৃষ্টির দিনে অবশ্য বিরক্ত হয় মা, বৃষ্টি হলে, কাপড় শুকোয় না, ভিজে ঘুঁটে ভিজে কয়লায় উনুন জ্বলে না, আরো কত কি, কিন্তু মানসীর বড় ভাল লাগে এই জল থই থই সন্ধ্যা। পুরোন নোংরা কলকাতাটা জলের চাদর মুড়ি দিয়ে হঠাৎ যেন অন্যরকম নতুন হয়ে যায়, আর জানলা দিয়ে সেই মেঘে ভরা জলে ধোওয়া আকাশ দেখতে দেখতে কোথায় যে চলে যায় মানসী। ভাল লাগে, খুব ভালো লাগে আর হঠাৎ কেমন কান্না পেয়ে যায় মানসীর। আর তখন কান্না পেতে, দু'চার ফোঁটা জল চোখ থেকে গালে, চিবুকে গড়িয়ে পড়তে দিতেই ভালো লাগে তার।

মনে হয় এই অন্ধকার দিনে কী যেন ঘটবে, কে যেন আসবে,

আর মুহূর্তে বদলে যাবে সব। কে যে তাকে নিরন্তর ডাকে, বৃষ্টির দিনে বুকের মধ্যে কত না জানা ফুলের গন্ধ ফোটায়, মনে হয় সেই বুঝি এসে দাঁড়াবে। আর তখন মুহূর্তে মিথ্যা হয়ে যাবে মন, এই ঘর বাড়ি, বাবা, শম্ভুদা, অফিস, ক্লাবের রিহার্সাল, সব। মানসী চলে যাবে, চলে যাবে তার সঙ্গে। কোথায়। জানে না, মানসী জানে না। শুধু যেতে যে ওকে হবেই এইটুকুই ওর জানা।

ছোটবেলায় মা বকলেই মানসী মাথা ঝেঁকে ঝেঁকে বল্‌ত, চলে যাব, আমি চলে যাব এখান থেকে। হ্যাঁ, চলে যাব।

অনেক দূর। অ-নে-ক দূর। টেনে টেনে বলত মানসী, আর মা হাসত হো হো করে, ছোট্ট মানসীর চোখ জলে ভরে উঠত, ও ছুটে পালাতে চাইত ঘর ছেড়ে, আর বাবা (তখনও হাত ভাঙেনি) টপ করে ওকে তুলে নিত কোলে। মানসীর আর যাওয়া হোত না, কিন্তু মানসী জানে, সেই শিশুকাল থেকেই জানে যে একদিন ও চলে যাবে। আর দিনের পর দিন সেই আশাতেই যেন প্রহর গোণে ও, আশায় আশায় থাকে। তার আগে, যা কিছুই সে করুক, সব তারই প্রস্তুতি, প্রতীক্ষা। তার প্রতীক্ষা শব্দটা নিঃশব্দে ঠোঁটের ওপর মিলিয়ে দিতে গিয়েই হাসি পেল মানসীর। কার প্রতীক্ষা করছে সে এখন? শম্ভুদার।

শম্ভুদা বলেছিল—'ঠিক সাড়ে ছটায় তৈরী থাকবে, আমি একেবারে ট্যাক্‌সি নিয়েই আসব, হর্ণ দেব, আর বেরিয়ে আসবে। তখনও যদি দেখি সাজ হয় নি…'

বাঃ! কবে আবার আমি দেরী করেছি। সব সময়ই তো ঠিক ঠিক সময়েই রেডি থাকি।

না, না। অনেক সময়ই থাকোনা। গোলমাল করে দাও, সব গোলমাল করে দাও। তোমাদের জন্য মাথা হেঁট হয় আমার। কত বড় বড় লোক সব। বোঝ না কেন বলো তো?

কাছে এসে চাপা সুরে গোপন কথা বলার মত সুরে বলে,

বুঝলে না। সাধ্য সাধনা করেও লোকে তাদের দেখা পায়না। আরে, টেলিফোনই ধরতে চায় না।

টেলিফোনও ধরতে চায়না। কেন? বড়লোক বলে এত অহঙ্কার?

ধ্যাৎ! মুখে চুক করে শব্দ করে শম্ভুনাথ—অহঙ্কার কেন হবে, কাজ, কাজ। কাজের মানুষ তো সব। এক এক ঘণ্টার দামই তাদের হাজার হাজার টাকা।

সত্যি! ওমা। তবে আমাকে যে তুমি নিয়ে যাবে বল,

বলিতো।

বাঃ। আমার সঙ্গে তাহলে তো তারা দেখা করারই সময় পাবে না।

হুঁ হুঁ। শম্ভুদার চোখটা কেমন মজার দেখায়, খুশীতে পিটপিট করলে। আমি আছি না এর মধ্যে। তাই আমার জন্যই তোমার সঙ্গে তারা দেখা করবে।

সত্যি। কত বড় বড় লোকের সঙ্গেই যে শম্ভুদার জানা শোনা এই কলকাতা শহরে। ভাগ্যে দেখা হয়ে গিয়েছিল শম্ভুদার সঙ্গে বাবার হাওড়ার হাটে।

নাহলে? নাহলে আর কি। না খেয়ে মরতে হোত এতদিনে। মা তো তাই বলে। বাবা বলে শম্ভুদা নাকি ভগবান। হাত ধরে দুঃখ সাগর পার করে নিয়ে যাবে।

বাবার কথাটা একেবারে মিথ্যাও নয়। শম্ভুদা এই বাড়িতে আসতে সুরু করে পর্য্যন্ত অন্তত দু'বেলার ডাল ভাতটা তো জুটছে। সেই মানসীদের ঢের।

আর মানসীর নিজের তো তার চেয়ে বেশিই কিছু জুটছে। মন কেমন করে মানসীর, খুব মন কেমন করে খোকন, রাখীকে ফেলে একা একা হোটেলে বসে খেতে। ইস্-স্। ভুল হোল আবার। হোটেল তো নয়, রেষ্টুরেণ্ট। হ্যাঁ, হ্যাঁ। রেষ্টুরেট। শম্ভুদা বলেছে হোটেল কাকে বলে দেখবি যখন সুটিং-এর জন্য বাইরে যেতে হবে কাশ্মীর কি

দার্জিলিং, শিলং নৈনিতাল। বড় বড় সব হোটেলে গিয়ে থাকতে হবে তখন। উঃ। ভাবতেই কি দারুণ লাগে।

দার্জিলিং, কাশ্মীর। বড় হোটেলে যদি নাই রাখে ওরা শুধু যদি নিয়ে যায়, এরোপ্লেনের দরকার নেই, ট্রেনে করেই যদি নিয়ে যায়, শুধু, তাতেই কৃতার্থ হবে মানসী। শুধু যেতে চায় মানসী,, কোথাও যেতে চায়।

শম্ভুদা বকে। বলে, খবরদার ওসব কথা বলবি না। প্রোডিউসার একবার যদি বুঝে নেয় যে তোকে যেমন তেমন জায়গায় রাখলেই হবে, তাহলে কোনদিনও, কখনও বড় কি এ ক্লাস হোটেলে রাখবেই না হয়ত হয়ত রেলের টিকিটই কেটে বসবে, তাও আবার সেকেণ্ড ক্লাস।

রেলের টিকিট কাটলেই বা ক্ষতিটা কি, যদিও ঠিক বোঝে না মানসী। আরও অনেক কিছুই অবশ্য মানসী বুঝতে পারে না, আর বাবা যেমন বলে, বুঝে মানসীর দরকারও নেই। শম্ভুদা যা বলে ঠিক ঠিক তাই করে গেলেই নাকি কেল্লা ফতে।

কেল্লা ফতে। কথাটা প্রায়ই বলে শম্ভুদা ; আরও অনেক মজার মজার কথা বলে, যা শুনে খোকন রাখী পর্য্যন্ত হেসে গড়িয়ে পড়ে। বাবা খুব গম্ভীর ভাবে বিড়ির ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, এইসব অইল খাস কলকাতিয়া কথা।

হ্যাঁ, শম্ভুদা হোল খাঁটি কলকাতার লোক, আর মানসীরা বাঙাল। বাঙাল, মানে বাংলা দেশ, পূর্ব বাংলা। কে জানে কেমন সে দেশ বা ছিল পাকিস্থান, মানসীর তো জন্ম কর্ম সবই এই পশ্চিম বাংলায়।

কলকাতায় এল ওরা অবশ্য পরে, সেই যখন বাবা কারখানায় ভাল চাকরী পেল। তখন কিন্তু কিছুদিন বেশ সুখেই ছিল ওরা। আর তার আগের দিনগুলোর কথা তো মানসীর মনেই নেই। ও তো তখন ছিল ছোট, এই এতটুকু, আর খোকনটা একদম বাচ্চা, আর রাখী হয়েছে সবে।

তখন কিছুদিন, মানসীর মনে আছে, একজন ঠিকে ঝিও ছিল.

মানসীদের। রোজ সকাল বিকাল এসে বাসন মেজে ঘর দোর ঝাঁট দিয়ে মুছে দিয়ে যেতো। কতদিন আবার সকালে মার দেওয়া মুড়ি খেতে খেতে মার সঙ্গে বসে গল্প করতো, মার হাতে পায়ে ঘষে ঘষে তেল মালিশ করতো, আর কাঁদত। হ্যাঁ, পাকিস্তানের গল্প করতে করতে খালি কাঁদত পরীর মা। ও ও নাকি পাকিস্তান, বাঙলা দেশেরই লোক। মানসীর বাবার মতোই ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। মেয়ে পরী রয়ে গেছে পাকিস্তানেই, আর ওর স্বামীকে দুষমণরা ' ক্যাইট্যা ফেলাল'।

পরীর মা কাঁদত, আর সঙ্গে সঙ্গে মাও কাঁদত, দেশের সমৃদ্ধি, সুখ, ঐশ্বর্য্যের গল্প করত ওরা। গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ আর 'সুপারি বৃক্ষের' সারি ছবিটা যেন দুলে দুলে উঠত মানসীর চোখের সামনে।

ভারী ইচ্ছা করত মানসীর একবার যেতে সেই তাদের আপন ভিটায়, যেখানে আম গাছের ছায়া উঠোন জুড়ে, লক্ষ্মীর আলপনা ঘরের দাওয়ায়, ধানে মাছে ভরা সংসার আর জানলা দিয়ে চোখ ফেললেই মস্ত বড়ো আকাশ খানা একেবারে ঘরের মধ্যে, আর বউ কথা কও পাখী ডেকে যায় উদাস মাঠে, রাত জাগা পাখী কাঁদে 'চোখ গেল' বলে।

তখনও সে স্কুলে পড়তো, সস্তা মিলের শাড়ীর ওপর লম্বা বেণী দুলিয়ে সুরে সুরে পড়া মুখস্ত করতো আর ভারতবর্ষের মানচিত্রের সামনে বসে সব কেমন গোলমাল হয়ে যেত, উল্টে যেত ছবিটা। আমাদের দেশে উত্তরে হিমালয় পর্বত কখন বিস্তীর্ণ উদার পদ্মায় রূপান্তরিত হোত, পাল তোলা নৌকা থেকে ভাটিয়ালির সুর ভেসে আসত, বাবার যুবক হাতে ঝকঝক করতো রূপালি ইলিশ, ঘাটের পথে মার পাশে পাশে হাঁটতো সে তাল সুপারির মধ্য দিয়ে। যাবই যাবই আমি সেই দেশে একদিন। আর তারপর সেই দেশও দেখা হলে, 'অন্য কোথা, অন্য কোন খানে'। সেই যে গায়ে কাঁটা দেওয়া কবিতাটা

আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন স্কুলের কল্পনাদি। আর সেই দিন, সেই কল্পনাদির গলার রিণরিণে 'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ' শুনে কেমন যে একটা অজানা কষ্ট আর ভাল লাগায় ভরে গিয়েছিল মানসীর বুক, তরুশ্রেণীর মত পাখা মেলে সেও হতে চেয়েছিল বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ। আর ছোট বেলার সেই চলে যাবার ইচ্ছাটা অনেক দূরে কোথাও হারিয়ে যাবার স্বপ্ন সেইদিন থেকেই মানসীর চোখে চিরদিনের বাসা বেঁধেছে।

আর এখন কোথায় হারিয়ে যেতে হবে মানসীকে, পার্ক ষ্ট্রীট। হ্যাঁ, শম্ভুদার সঙ্গে সেই রকমই কথা আছে।

প্রথম প্রথম এই পার্ক ষ্ট্রীটে যেতেই কি মজাই যে লাগত মানসীর। আলো জ্বালা ঝকঝকে সব ঘর, নীচু সুরে বাজনা বাজছে, কোথাও হয়ত ষ্টেজের ওপর পা ঠুকে ঠুকে ইংরিজি গান গাইছে রং মাখা কোন মেয়ে। কিন্তু গিয়ে গিয়ে এই বন্ধ ঘরগুলোয় আজকাল আর ঢুকতে ইচ্ছা করে না মানসীর। হাঁফ ধরে, বেশীক্ষণ বসে থাকতে ভয় ভয় করে মানসীর। মনে হয় এই চাপা আলো আর নীচু সুরের অর্কেষ্ট্রার সুরের তলায় চাপ বেঁধে আছে অন্ধকার, অর্থাৎ লাফিয়ে পড়বে মানসীর ওপর, ঢেকে দেবে চাপা দিয়ে দেবে মানসীকে। ও আর বেরুতে পারবে না। মনে মনে কতদিন ছটফট করে উঠেছে মানসী। চোখের সামনে দুলে দুলে উঠছে বিরাট নদী কি উত্তাল সমুদ্র, ঘন গাছের সারি উঁচু মাথা পাহাড়।

হবে, হবে, শম্ভুদা বলে। দার্জিলিং, সিমলা, শিলং কত পাহাড় দেখতে চাও, আশ মিটিয়ে দেখ। তবে, ধীরে রজনী ধীরে। ছাখনা কোথায় তোমায় তুলে দিই।

কে জানে কবে যে ওদের শম্ভুদা তুলে দেবে সুখের সেই স্বর্গলোকে, তবে একা এত সব পাহাড় পর্বতে ঘুরতে ভালোই কি লাগবে মানসীর ?

একা কোথায়। চোখ বুজে ঠোঁট চিপে কেমন একটা মজার

মুখ ভঙ্গী করে শম্ভুদা। গোটা ইউনিটটাই তো তখন থাকবে তোমার সঙ্গে। আর আমিই তো থাকব। নিজের বুকে হাত দিয়ে সগর্বে হাসে শম্ভুনাথ।

মানসীর হাসি পায়, হ্যাঁ শম্ভুদা তো থাকবেই, আর সব সময়ই তো সে আছে সঙ্গে। রাস্তায়, রেষ্টুরেণ্ট, রিহার্সালে। শম্ভুদা আর বাবা। তাই একা মানসী কখনও নয়, তবু কেন ওর সব সময়ই মনে হয় ও একা? রেষ্টুরেণ্টে বসে চপে কি কাটলেটে ছুরি চালিয়ে কাঁটা দিয়ে উঠিয়ে মুখে তুলতে গিয়ে হঠাৎ ওর ভারী মন কেমন করে ওঠে খোকন কি রাখীর জন্য। মার জন্যেও এসব খাওয়া ও যে পৃথিবীতে আছে, খাওয়ার যে আবার এত কায়দাও আছে তা তো বেচারারা জানেই না। এসবের জন্যই কৃতজ্ঞ মানসী শম্ভুনাথের কাছে। কেমন করে কাঁটা ধরতে হয়, ছুরি চালাতে হয়, পর্দা ঢাকা টেবিলে বসে শম্ভুনাথই ওকে শিখিয়েছে। বাবা অবশ্য এখনও হাতেই খায়। বলে, ওতে আমার সুখ হয় না শম্ভুনাথ, খাওয়ার মজাটাই চলে যায় ছুরি কাঁটার যুদ্ধে।

আরো অনেক কিছু মানসীকে শেখায় শম্ভুনাথ, বলে দ্যাখোনা, কোথায় তোমাকে তুলে দিই। কে জানে, কবে সেই সুখের স্বর্গলোকে মানসীদের তুলে দেবে শম্ভুনাথ তবে এখনও পর্য্যন্ত ওরা যে বেঁচে আছে, পাকা বাড়ীতে মাথা গুঁজে আছে, সেও তো শম্ভুনাথেরই জন্য।

এ'বাড়ীর সন্ধানও তো শম্ভুদাই দিয়েছিল। বলেছিল আপনি চলে আসুন কাকাবাবু, বাকী সব ভার আমার।

বাবার তখন চাকরী গিয়েছিল ধর্মঘটে যোগ দেবার জন্য, কিন্তু তখনও পুরোন বাড়িতেই ছিল ওরা আর বাবা চেষ্টা করছিল মালিক পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে চাকরীটা যদি আবার ফিরে পাওয়া যায়।

শেষ পর্য্যন্ত চাকরীটা আর ফিরে পাওয়া যায় নি, আর রাতের অন্ধকারে স্ত্রী পুত্র কন্যার হাত ধরে পালিয়ে আসতে হয়েছিল যোগেন্দ্রনাথকে শ্রমিকদের ভয়ে গঙ্গার এপারে এই কোন বড়লোকের

ফেলে যাওয়া বড় বাড়ির এক কোণে। শম্ভুদা শুধু এই বাড়িতে এনেই তোলেনি তাদের ঘুঁটে কয়লা, চাল, ডাল, তেল, নুন একমাসের মত সব এনে দিয়েছিল পরের দিনই।

বলেছিল, চুপ করে বসুন তো আপনি কাকাবাবু। সব আমি দেখে নেব। মারবে। ইস্। মারলেই হোল? ও আপনার ইউনিয়ন আর ঝাণ্ডাওলাদের যত লপচপানি (এই আর একটা অদ্ভুত কথা বলে শম্ভুদা) ঐ গাঁয়ের ওপারেই। হাওড়ায়। দূর দূর, হাওড়ায় আবার মানুষ থাকে নাকি?

কলকাতায় চলে আসুন; আমাদের এলাকায়। দেখবেন কেমন আস্তে আস্তে আপনাকে কোথায় তুলে দিই আমি।

যেমন বলেছিল তেমন একটা কিছু না দিতে পারলেও মনে হয় হবে, কিছু একটা খুব তাড়াতাড়িই হবে।

শম্ভুদার মুখ দেখলেও ভরসা পাওয়া যায়, আর দুশ তিনশ নাই হোক, তাদের এই অভাবের সংসারে দু'তিন টাকা যখন যা দরকার শম্ভুদাই তো দেয়।

বাবা অবশ্য বলে যে ধার নিচ্ছি, সব শোধ দিয়ে দেব একদিন, কিন্তু শম্ভুদা তো ফেরৎ চায় না। কতদিনইতো শম্ভুদা বলেছে ছাখ মানি, তোমাদের কাছ থেকে আমি কিছুই চাই না। শুধু তুমি বড় হও এই দেখেই আমি খুশী।

বড় হও, বড় হও, সব সময়ই বলে শম্ভুদা। বড় হবে মানসী? কত বড়? মাথায় তো মাকে কবেই ছাড়িয়েছে, বাবাকেও প্রায় ছুঁই ছুঁই। বয়সও ষোলো পার হয়ে এল। আরো বড় মানে, বুড়ো হতে হবে নাকি?

না, না তা কেন? দূর। শম্ভুদা মাথা তুলে খুব বীরের ভঙ্গি করে—বলে, বড় মানে মানে বড়, নামে বড়, অর্থে বড়।

কি করে নামে বা মানে সে বড় যে বড় হওয়া যায়, এমন কি অর্থেও আগে তা বুঝতো না মানসী। 'লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী

ঘোড়া চড়ে সেই' হাওড়ার অনু পিসীমা বলতেন, আর ইস্কুলের পণ্ডিত মশাই বলতেন, পণ্ডিত ব্যক্তিই সম্মানীয় 'বিদ্বান সর্বত্র পুজ্যতে'।

কিছুদিন আগেও এই কথাগুলোর জন্যই বড় গোলমাল লাগত মানসীর। লেখাপড়াও করতে পারলো না, স্কুল অবধি ছাড়তে হোল, আর কি করে বড় হবে ও তবে ?

কি করে সে লেখাপড়া না করেও অনেক অর্থ খ্যাতি অর্জন করা যায়, গাড়ী ঘোড়া চড়া যায়, স্বদেশে বিদেশে লাখ লাখ লোকের আশ্চর্য ভালবাসা ভক্তি পাওয়া যায় সে সত্য মানসী বুঝেছে এতদিনে। শম্ভুদাই বুঝিয়ে দিয়েছে মানসীকে, আর বাবাও বুঝিয়েছে। মানসীকে বড় করতে, বিখ্যাত করতে শম্ভুদার চেয়ে বাবার আগ্রহও কিছু কম নয়।

বাবা আরও বলে, তোর ভরসাতেই তো আছি মা। প্রথম সন্তান তুই, পুত্রতুল্য। মেয়ে তো নয়, তুইই আমার বড় ছেলে।

বলে, আর অদূর ভবিষ্যতে মানসীর বড় হবার, অতুল ঐশ্বর্য শালিনী বিখ্যাত চিত্রতারকা হবার রঙীন ছবিগুলো কেমন সহজে মানসীর চোখের সামনে এঁকে এঁকে যায়, আর এই সময় নিজেকে সত্যিই খুব বিখ্যাত অতি জনপ্রিয় আর অত্যন্ত ধনবতী, মহিমময়ী মনে হয় মানসীর। আহা বেচারা বাবা। ঘাট থেকে পড়ে ডান হাতটা পর্যন্ত অচল। অনেক টাকা নাহলে বিলেত থেকে হাত সারিয়ে আসবে কি করে বাবা, কি করে ভাল হবে বাবার ? সুস্থ, স্বাভাবিক হবে ?

অর্থের, অনেক অনেক অর্থের প্রয়োজন তাই। দিনরাত খেটে সেই অনেক টাকা, অঢেল টাকা তাই উপার্জ্জন করতে হবে মানসীকে।

শম্ভুদা বলে 'তিন সিফটে' কাজ করতে হবে মানসীকে, যেমন করে বম্বের আর্টিষ্টরা। মানসী প্রস্তুত। নিদারুণ পরিশ্রম করে রাশি টাকা উপার্জ্জন করার জন্য মানসী অনুক্ষণ অস্থির, উদ্বেল। কিন্তু কাজ কোথায় ? কাজ ?

হবে, হবে, দাঁড়াও না। শম্ভুদা সেই রকম মজার চোখ পিটপিট

করে বলে, সেই চেষ্টাইতো করছি। কাজের জন্য আগে 'পার্টি বধ' করতে হবে তো। আর সেই পার্টি বধের জন্যেই তো আজ যাওয়া। কিন্তু কই? শম্ভুদা তো এখনও এলো না।

মানসী বাবার পুরোন হাত ঘড়িটায় সময় দেখল, সাতটা বেজে কুড়ি। শম্ভুদা বলেছিল, আসবে ঠিক সাড়ে ছটায়। আর সময় সম্বন্ধে শম্ভুদা সত্যিই অতি 'পাংচুয়াল'।

হুঁ হুঁ বাবা, বুকে হাত রেখে শম্ভুদা বুক টান করে বলে, এ বাবা শম্ভু শর্ম্মা, সময়ের এক মিনিট এদিক ওদিক পাবে না আমার কাছে। আর জানো মানি সাহেবরা যে এত বড় হয়েছে, এই গুণেই। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় আমার কথা মিলিয়ে নেবে তুমি। এক মিনিট এদিক ওদিক পাবে না কখনও। আর আজ অবধি সত্যিই শম্ভুদা কখনও এক সেকেণ্ড দেরীও করেনি···তবে? আজ হোলটা কি? ঝড় বৃষ্টির জন্যই আটকে পড়ল কোথাও, নাকি?

ধ্যাৎ। ভাল লাগছে না মানসীর। একটু আগেই যদিও আজ আর বেরুতে হবে না মনে করে বেশ ভালই লাগছিল মানসীর। শেখর বসুর নতুন উপন্যাসটা চেয়ে এনেছে লেকের বন্ধু জয়ন্তীর কাছ থেকে, শুয়ে শুয়ে সেইটা পড়বে মেঘলা আকাশের দিকে চেয়ে, সেই কথাই ভাবছিল, কিন্তু এখন হঠাৎ আবার কেন আলোজ্বলা পার্ক ষ্ট্রীট হাতছানি দিল। নাঃ। খালি এই যাওরা আসা, সেই রবি ঠাকুরের গানের মতন, কিন্তু শুধু ফিরে চাওয়াটা কি? ফিল্মের চান্স? দূর। সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে তাওতো চায় না মানসী, কিন্তু চাইতেই হয়, শম্ভুদা বলেছে বাবার জন্য, সংসারের জন্য। আর তাই সব সময়ই ভাল না লাগলেও মানসী সাজগোজ করে সব সময়ই প্রস্তুত 'চান্স' পাবার জন্য রিহার্সালে যাবার জন্য।

কিন্তু আজ হোলটা কি শম্ভুদার। ধ্যাৎ। মিথ্যে এত যত্ন করে সাজ করল মানসী। অবশ্য সাজতে মানসীর খারাপ লাগেনা যদিও বরং শুধু শুধুই, কেবল মাত্র নিজের জন্যই সাজতে মানসীর ভালই

লাগে, কিন্তু খুব কমই এমন বিলাসিতায় নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারে মানসী। পাউডার লিপস্টিক সবই তো শেষ হয়ে এসেছে।

আর এই অরেঞ্জ লিপস্টিকটা। যেটা ঠোঁটে লাগালে কমলালেবুর কোয়ার মত ফুলো ফুলো ঠোঁট ওর আরো টসটসে ফলের মত দেখায় সেই লিপস্টিকটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে একেবারে এই এতটুকু। তুলে ধরে ঠোঁটে বোলান আর যায় না। মাথায় কাঁটা দিয়ে কি দেশলাই কাঠি দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করে আঙুল দিয়ে ঠোঁটে লাগতে হয়। কমপ্যাকট-টা তো কবেই ভেঙে গুঁড়ি গুঁড়ি। সাবধানে কাপড়ের খুঁটে একটু লাগিয়ে আরো সাবধানে ধীরে ধীরে মুখে বোলায় মানসী। কাজলটা চলবে অবশ্য আরো কিছুদিন। কিন্তু ঐ ছোট টিনের কাজল পরতে আর মানসীর ভাল লাগে না। নতুন যে অফিস ক্লাবের রিহাঁসালে গিয়েছিল সেদিন, সেখানে সেই অঞ্জলি রায় বলে যে মেয়েটি 'হিরোইন' করছে, ফিল্মেও নাকি সে অভিনয় করে, সে চোখের পাতার ওপর কি ঘন কালো উজ্জ্বল রেখা টেনেছে, কি দিয়ে যে··· কাজলে তো অত সুন্দর হয় না, আর মুছে মুছেও তো যায়। মানসী আয়নায় হাতে নিয়ে বহুবার চেষ্টা করে দেখেছে কাজল কি কালো ঐ আঁকা পেন্সিল কিছুতেই সেই ঘন গভীর টান চোখে আসে না। শেষ পর্য্যন্ত সাহস করে মানসী মেয়েটিকেই জিজ্ঞাসা করেছিল, চোখের ওপর কি দিয়েছেন ভাই? কা-জ-ল?

আই-লাইনার। খুব গম্ভীর, একটু বা বিরক্ত গলা অঞ্জলি রায়ের। আর উত্তর দিয়েই মানসীর পাশ থেকে উঠে অন্য দিকে চলে গিয়েছিল ফিল্ম এ্যাকট্রেস অঞ্জলি রায়। বোধ হয় আইলাইনার চেনে না এমন অজ্ঞ মেয়ের পাশে বসতে ওর মানে লেগেছিল। মানসীর অন্ততঃ তাই মনে হয়েছিল সেদিন, আর খুব লজ্জা করেছিল, খুব খারাপ লাগছিল। ইচ্ছা হয়েছিল ছুটে পালিয়ে আসে বাড়ীতে। দরকার নেই, আর দরকার নেই অফিস ক্লাবে থিয়েটার করে পঞ্চাশ টাকা রোজগার করার। কিন্তু মুখ ফুটে একথা বাবা কি শম্ভুদাকে বলবার সাহস

হয়নি মানসীর। পাঁচ টাকা হলে পুরো রেশনের চালটা ঘরে আসে, সেখানে পাঁচ দশে পঞ্চাশ অর্থাৎ দশগুণ বেশী টাকা কি করে ছেড়ে আসবে মানসী? না, এখন যা খুশী করার স্বাধীনতা মানসীর নেই। একটু মানে লাগলেই গট্‌গটিয়ে বেরিয়ে আসার মত স্বাধীনতা হয়ত ঐ জয়ন্তীর আছে, লেকের ধারে মস্তবড় বাড়ীর দু'তলার বড় ফ্ল্যাটে যারা থাকে। বাঘের মত কুকুর চেনে বেঁধে বেড়াতে আসে, বাড়ীর গাড়ী করে দূরে সাহেবী স্কুলে পড়তে যায়। জয়ন্তীর নিজের কাছেই থাকে কত টাকা। মানসী দেখেছে লেকে যখন ফুচকা, আলুর দম খাবার জন্য দাম দিতে যায় জয়ন্তী। ওর ঠাসাঠাসি নোটে ভরা ব্যাগটা অনেক বার চোখে পড়েছে মানসীর, আর মনে হয়েছে কবে ওর ব্যাগও ভর্তি থাকবে এমনি টাকায় ভরা।

জয়ন্তীর বাবা বিজনেস করেন, অনেক টাকা তাদের কিন্তু মানসীর বাবা তো কিছুই করেন না, মানসীকেই তাই করতে হবে ব্যবস্থা। হ্যাঁ একদিন মানসীও টাকা করবে, অ-নে-ক, অ-নে-ক টাকা আর সেই টাকা দিয়ে কিনে নেবে যা খুশী তাই করার ক্ষমতা। ইচ্ছে হলে অঞ্জলি রায়ের অভদ্রতার উত্তরে ঠাশ করে এক চড়ও মেরে দিতে পারবে, পারবে শম্ভুদাকে বলতে, আজ আমার আর ইচ্ছে করছেনা এই বাদলার সন্ধ্যায় বেরুতে শম্ভুদা। আজ আর আমি বেরুব না। কিন্তু আজ তো বেরুতেই হবে, কারণ আজ বড় ব্যাপার, শম্ভুদার ভাষায় পার্টিবধ। ফিল্‌মের পার্টি। ফিল্‌ম হবে, মানসীর মা যাকে বলে বায়স্কোপ। আর বায়স্কোপে মানসী অভিনয় করবে শুনে মার তখন সে কি রাগ। কও কি? মাইয়ার রোজগারে খাইবা? তারে বাজারে নিয়া নাচাইবা?

কও কি? কও কি তুমি। বাবা ধমকে উঠেছিল মাকে। যা বুঝনা, তা লইয়া কথা কইতে আইস্যো না। মাইয়ার রোজগার খাইবানা। তা খাও, কোন শ্বশুরের ঘর আসে তুমার, সেইহান্ হইতে ট্যাহা লইয়া আইস, নয়ত উপাস যাও।

আরো কত কথা যে বাবা বলেছিল মাকে, আর দেশের ভাষায় তাড়াতাড়ি কথা বলে গেলে মা বাবার কথা অর্ধেক বুঝতেই পারে না মানসী। মা অবশ্য সব সময় সেই ভাষাতেই কথা বলে তবে বাবা বলে, এখন নাকি অনেকটাই 'কলকাতাইয়া-ঢং' আইস্যা গেসে মার কথায়। কিন্তু বাবা তো মানসীর মতোই কথা বলে। শুধু মার সঙ্গে ঐ 'দ্যাশের' ভাষা। বাঙাল, বাঙাল ভাষা। শুনলেই মা চটে। হ, হ বুঝছি। ইংরাজ আইছস সব জাহাজে চইড়্যা। মেম সাহেব আসছস জাহাজ কইর‍্যা বিলাত হইতে—হুঃ।

না, বিলাত থেকে আসেনি বটে, তবে বিলেতে একবার যাবার বড় সখ মানসীর। জাহাজ থেকে না নামুক, জাহাজে করে যেতে তো পারে। সে শুনেও শম্ভুদার কি হাসি। আরে। জাহাজে চড়ে একমাস ধরে টুকটুক করে বিলেত যায় নাকি আজকাল কেউ? আর সময় কোথায় অত? সাঁই সাঁই প্লেনে করে একদিনে পৌঁছে যাবে বিলেত, আমেরিকা, হনলুলু।

সুটিং সেরে সাতদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে আবার। নাহলে কোম্পানীর কত লস জানো? হুঁ হুঁ বাবা। আদ্দেক ছবি মার খায় ঐ জন্যে। ওভার হেড ঠেনে চলে সব।

মানসী অবাক হয়ে শোনে, বেশ ভালো লাগে শুনতে। সে যদি প্যারিস কি লন্ডনে কেনাকাটা করতে করতে ফিরতে দু'চার দিন দেরী করে ফেলে, আহ্লাদী মেয়ের মত অবুঝ হয়, হিরোর সঙ্গে এখান ওখান বেড়াতে চলে যায়, তাহলে তখন বসে বসে প্রোডিউসারের কপাল চাপড়ান ছাড়া উপায় কি?

অন্যায়! খুব অন্যায়। মানি, তুমি কখনও ঐরকম কোরোনা।

শম্ভুদার গম্ভীর মুখটা তখন কিরকম যেন অন্য কারুর মত দেখায়। শম্ভুদা আবার বলে, প্রোডিউসারকে এমন ভাবে ডোবান খুব অন্যায়। না, মানি, না, কখনও ঐরকম কোরোনাকো।

সুটিংটি শেষ করে যাও যেখানে খুশী, ডেট যখন দেবে, তখন ঠিক

ঠিক ডেট রাখতেই হবে, বুঝলে ?

মানসী বোঝে। মনে মনে প্রতিজ্ঞাই করে ফেলে যে ও কখনও এরকম করবেনা।

ওর ভাল লাগুক না লাগুক, সেদিন যেমন চুপ করে বসেছিল অঞ্জলি রায়ের ছেড়ে যাওয়া চেয়ারের পাশে, তেমনি ঘড়ির কাঁটা ধরে সব কাজ মিটিয়ে দেবে মানসী, চুকিয়ে দেবে প্রোডিউসারের সব পাওনা। হিরোর সঙ্গে বাইরে ঘুরে, রেষ্টুরেন্টে খেয়ে যত রাত করেই ও বাড়ী ফিরুক, সকাল দশটায় মানসী রায় মেকআপ নিয়ে রোজই থাকবে তৈরী।

যেমন আজও প্রস্তুত ও সেই সাড়ে ছটা থেকেই। কিন্তু কই ? কোথায় শম্ভুদা ?

ঝনঝন করে কাঠের দরজার ওপর লোহার শিকল বাজার শব্দ হোল।

এই। এতক্ষণে এলেন বাবু। মানসী ছুটে গিয়ে দরজা খুলল, বাবাঃ। শম্ভুদা এত দেরী করে ? ওমা। বাবা তুমি ? এঃ। একেবারে ভিজে গেছ যে। মানসী আঙুলের ওপর উঁচু হয়ে ছিটকিনি তুলল।

কি ব্যাপার বলোতো তোমাদের ? শম্ভুদা বলে গেল ঠিক সাড়ে ছটার সময় আসবে।

বাবা যোগেন্দ্রনাথ মুখের বিড়ি মাটিতে ফেলে জুতোর চাপে আগুন নেবালো।

আসছে, আসছে শম্ভুও আসছে। তুই চট্ করে একটু চায়ের জল বসাতে বল তো তোর মাকে।

মানসী ভুরু কোঁচকাল, চোখে বিরক্তির ছায়া। বলল, তোমার তোমার সাড়া পেয়ে চায়ের জল মা ঠিকই বসিয়েছে, কিন্তু যাওয়া হবে কিনা বল আগে, তাহলে ভাল শাড়িটা খুলে ফেলি মিথ্যে সাজলাম।

আঃ ? এ মাইয়াটা জ্বালাইল ছাখছি। বিরক্ত হলে মাঝে মাঝে

যোগেন্দ্রনাথ দেশের ভাষায় কথা বলে। আর এই ভাষায় কথা বললেই আজকাল বিরক্ত লাগে মানসীর।

কি যে বাঙাল ভাষা বল বাবা, লোকে শুনলে বলবে কি ?

হঃ! লোকে শুনলে বলবে ? ক্যান ? আমাগো নিজের ভাষায় আমি কথা কই! লোকের বলনের কি ধার ধারি।

নাঃ! ধার ধারো না তো মিথ্যে করে সেদিন বিশ্বাসবাবুকে বললে কেন আমরা বললে কেন আমরা হুগলি জেলা, চুঁচড়োর লোক।

আহা, বাবা একটু লজ্জা লজ্জা মুখ করে,—সে বললাম তোরই জন্য। ফিল্মে ওরা বাঙাল মেয়ে নিতে চায় না যদি কথায় বাঙাল টান থাকে। আর তোর তো নেইও তা।

নেই-ই তো। আর তোমাদের ক্যান্, কমু শুনলেও আমার রাগ ধরে। দুপদাপ করে পা ফেলে পাশের ঘরে চলে গেল মানসী।

যোগেন্দ্রনাথ খুব উদার ভাব করে হাসল, বলল, পাগলী। টিনের চেয়ারে বসে আর একটা বিড়ি ধরাল। ব্যাপারটা কি হোল ঠিক বুঝতে পারছে না আজ যোগেন্দ্রনাথ।

পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে ঠিক সময়েই এসেছিল শম্ভু তবে এসেছিল একা। মানসীকে সঙ্গে না দেখে একটু অবাক হয়েছিল যোগেন্দ্রনাথ। খুকী কই ? আসে নাই ? নাকি বসিয়ে এসেছ ওকে রেষ্টুরান্টে ?

না, না। বলছি, আসুন। যোগেন্দ্রনাথের হাত ধরে টেনে রাস্তা পার হোল শম্ভু, কেমন যেন চিন্তিত বুঝিবা একটু বিবরণও দেখাছিল শম্ভুকে। উল্টোদিকের ফুটপাতে উঠে যোগেন্দ্রনাথের হাত জোড় দিয়ে শম্ভু বলল, একটু গোলমাল হয়ে গেছে।

গোলমাল ?

না, না,। ঠিক গোলমাল নয়,…মানে, ওরা রেষ্টুরেন্টে বসতে চাইছে না, এই আর কি।

ক্যান্! অবাক হলে অতর্কিতে দেশের ভাষাই বেরিয়ে পড়ে যোগেন্দ্রনাথের মুখ দিয়ে। সংশোধন করে যোগেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি

বলল কেন? কেন? ব্যাপারটা কি?

না, মানে·· শম্ভু যেন একটু বিব্রত। ব্যাপার তেমন কিছুই নয়, মানে মিঃ ভোস খুব বড়লোক তো মানে, খুবই বড় বিজনেস ম্যান, তাই আর কি···মানে।

হ্যাঁ, তাতো ঠিকই। যোগেন্দ্রনাথ মাথা নেড়েছে বড়লোক তো বটেই, নাহলে আর ছবি করে কি করে? সে তো জানা কথাই।

না, মানে ব্যাপার হয়েছে কি, একটু ইতস্তত করে শম্ভু, তারপর প্রায় মরিয়া হয়েই বলে ফেলে, মানে, আজ আর আপনার যাওয়া চলবে না ওখানে।

ক্যান্! বিস্মিত যোগেন্দ্রনাথের মুখ দিয়ে আবার দেশের ভাষা, তার নিজের ভাষাই বেরিয়ে পড়ে। আমার যাওয়া চলবে না?

মানে শুনুন না, বলছি বুঝিয়ে।

অকারণেই একবার কাসে শম্ভুনাথ, কোঁচাটা ঝাড়ে ঝপাং করে, রোগা বুকে শার্টের পকেটে হাত বোলায়, মানে, এসব ব্যাপারে··· এই বাবা টাবা থাকলে অসুবিধে হয় আর কি।

তবুও ব্যাপারটা স্বচ্ছ হয় না যোগেন্দ্রনাথের কাছে, বলে, এতকাল ধরে তো আমিই যাই মেয়ের সাথে রিহারছালই বল, আর হোটেলে খাওয়াই বল, তো আজ হঠাৎ আবার কিসের অসুবিধা?

আছে। শম্ভুনাথ এবার আরো একটু ঘন হয়ে আসে যোগেন্দ্রনাথের কাছে, গলার স্বরও নীচু করে একটু তারপর হাতে অল্প একটু চাপ দিয়ে বলে, দেখুন, হিরোহিনের সঙ্গে ওরা একটু মন খুলে কথাবার্তা বলতে চায় চায় আর কি। বুঝে নিতে চায় ও পারবে কিনা ওই শক্ত রোল।

যোগেন্দ্রনাথ তবু বুঝতে পারে না। ভ্রু কুঁচকিয়েই থাকে। শম্ভু এবার কনুই দিয়ে যোগেন্দ্রনাথের পাঁজরে ঠেলা দেয়।

ন্যাকা। বোঝেন না যেন কিছু আপনার মেয়ের মত লাখ লাখ মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ফিল্মে একটা চান্স পাবার জন্য শুধু শুধু আপনার

মেয়েকে হিরোইন করবে কেন তারা যদি একটু গল্পসল্প করতে, ঘুরতে ফিরতে নাই পারে তার সঙ্গে।

যোগেন্দ্রনাথ তবুও ভাল বোঝে না। কথা তো সকলের সাথেই কয় মাণি। গাড়ী করে বেড়াতেও তো গেছে কয়েকবার। তুমি না আরো তিন চার পার্টি আগে আনলা। তা কথাই, খালি কথাই।

সব সময়ই তো আপনি ছিলেন সঙ্গে। বিরক্ত হয়ে বাধা দেয় শম্ভুনাথ। কথা তাই কথাতেই আর সেই জন্যেই তো আজ পর্যন্ত আমার অবধি হোলনা কিছু।

তোমার? ঘোলাটে চোখ বিস্ফারিত করে তাকায় যোগেন্দ্রনাথ। তোমার আবার কী হবে হে শম্ভুনাথ? তুমি তো আমাগো জন্যই সব কিছু···

হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনাদের জন্যই তো। শম্ভু বেশ বিরক্ত হয়েছে বুঝতে পারছিল যোগেন্দ্রনাথ। আমি না থাকলে আপনার মেয়ের হবে নাকি কিছু? কাঁচকলা।

হ্যাঁ। তাতো ঠিকই।

তবে। প্রডাকশনে আমি যদি না থাকি, তবে আপনার মেয়েকে ওরা যা হিরোইন করবে জানা আছে। দেবে ঠেলে একস্ট্রার রোলে, তাই আমাকে প্রডাকসানে থাকতে হবে না?

হু' হু! সে তুমি কর না ইচ্ছামত, আমি কি বাদ সাধছি! কিন্তু এখানকার ব্যাপারটা, কি যে কইছ তাইতো বুঝছি না।

ব্যাপার আর কি, হাঁটতে হাঁটতে বুক টান করে দাঁড়িয়ে পড়ে শম্ভুনাথ। আপনি বাড়ীতে গিয়ে মাণিকে বলুন তৈরী থাকতে, ওকে নিয়ে আমি একাই বেরুব ;

ওরে নিয়ে একা তুমি? আবার ঘোলাটে চোখে চায় যোগেন্দ্রনাথ।

হ্যাঁ হ্যাঁ। এতে এত ঘাবড়াবার কি আছে? আমিই তো সঙ্গে রয়েছি।

পকেট থেকে খড়মড় করে দশ টাকার নোট বার করল শম্ভুনাথ,

যোগেন্দ্রনাথের হাতের মধ্যে গুঁজে দিল নোটটা। তারপর বলল, আপনি ট্যাকসি নিয়ে চলে যান, বৃষ্টি পড়ছে এখনও, ভেজবার দরকার নেই। মানিকে তৈরী থাকতে বলুন, আমি ঠিক নটার সময় গাড়ী নিয়েই যাব।

যোগেন্দ্রনাথকে আর কোনও কথা বলার অবসর না দিয়েই লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল শম্ভুনাথ। চলন্ত গাড়ীর আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল।

দোকানের সামনে ঢাকা বারান্দায় আরো কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল যোগেন্দ্রনাথ, উঁকি দিয়ে দোকানের বড় ঘড়িটায় দেখল, তখনও সাতটা বাজেনি। শম্ভু তো যাবে নটায়। অনেক অনেক সময় আছে এখন। বাসে গিয়েও ঠিক সময়ের আগেই পৌঁছে যাবে যোগেন্দ্রনাথ, ট্যাকসি করার কোনও দরকারই নেই।

ই। টেকচি। শম্ভুবাবুর আবার কথায় কথায় টেকচি চাই। শালা এমনিতে দশ টাকার নোট ছাড়তে সাতবার ভাববে, কিন্তু ট্যাকসির জন্য ফস ফস বেরুচ্ছে পাঁচ-দশ।

আরে বাবা। আমি অইলাম নিচ্ছিন্দি পুরার যোগীন্দর। আমি কয়দিন টেকচি চড়ছি তোমার টেকচির পয়সায়? একদিনও না। বড় আইলেন রাজপুত্র, কথায় কথায় মোটর গাড়ী।

ঝিরঝির বৃষ্টি মাথায় করেই যোগেন্দ্রনাথ হাঁটতে শুরু করে দিল। বেশ কিছুটা পথ হেঁটে এসে উঠেছিল বাসে। আর এইত পৌঁছে গেল আটটা বাজার অনেক আগেই। তবে? আর বেরুতে যখন আর হবেই না, তখন এই বাদলায়? রাতে বরং একটু গরম গরম খিচুড়ি খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া যাক। মানি ফিরলে ওদের মা শৈলবালাই দেবে দরজা খুলে। ভালমন্দ খাবার আজ কপালে নেই। উপায় কি। কিন্তু ব্যাপারটাও তো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কি যে হোল।

শম্ভুর কথায় মেয়েকে তো সে সব জায়গাতেই নিয়ে গেছে। হোটেলে, অফিস ক্লাবে, ফিল্ম ষ্টুডিয়ো সব, সব জায়গায়।

আর না নিয়ে গেলে চলবে কি করে যোগেন্দ্রনাথের সংসার? বাঁচতে তো হবে। বাড়ী ভাড়াটাই যা লাগে না, কিন্তু আর সব? সারাদিন ঘোরে যোগেন্দ্রনাথ, এই কলকাতার পথে পথে নাকি টাকা ছড়ানো আছে তুলে নিলেই হয়। কিন্তু কই, ভাঙ্গা হাতে দু'চারটে ঠুনকো দালালির দু'একশ টাকা ছাড়া আরতো কিছু তুলতে পারল না যোগেন্দ্রনাথ। আর সেই একশ কি পঞ্চাশ টাকা ও তো নিয়ম মত আসে না, যেমন আসত কারখানার মাইনে। তবে, সংসারটা যোগেন্দ্রনাধ চালাবে কি করে? ভাগ্য ভাল যোগেন্দ্রনাথের মেয়েটা বড় হয়ে উঠেছে, আর চেহারাটা এই অভাবের সংসারেও চোখে পড়বার মতো। কোনরকমে টলমল করে চালিয়ে যাচ্ছে—তাই যোগেন্দ্রনাথ সংসারটা অবশ্য শম্ভুনাথ যতখানি আশা দিয়ে এনেছিল হাওড়া থেকে, তার কিছুই হয়নি এখনোও, তবে ও বেচারা চেষ্টার ত্রুটি করে না। নাঃ। ছেলেটা ভাল, সত্যিই ভালবাসে তাদের, আর তাদের ভালর জন্য, দুঃখ কষ্ট ঘোচাবার জন্য সব সময়ই ভাবে। নাঃ! শম্ভু লোক ভাল। তেমন সে কিছু করে উঠতে পারছেনা, তার কারণ বরাত, যোগীন্দ্রর ফুটো কপাল। আর মানিও তো প্রথম প্রথম শহুরে কেতা জানত না এত। বালিগঞ্জের মেয়েদের মত এত স্মার্ট ছিল কই? এখন মনে হয় ঢং ঢাং, আদব-কায়দা অনেকটাই মানির রপ্ত হয়ে গেছে। কি লাজুক ছিল, কি ভীতু। আর যোগীন্দ্রনাথ নিজেই কি কম ভয় পেত প্রথম প্রথম মেয়েকে নিয়ে বেরুতে। আর মেয়ের মা তো একেবারে রণচণ্ডী। মেয়েকে অন্য পুরুষ মানুষের সঙ্গে থিয়েটার করতে দেবেই না। অথচ, এই দুমাসে তিনটে থিয়েটার করে নগদ তিনশো টাকা ঘরে এনেছে মানি। আর খাওয়া দাওয়া, পরের পয়সায় গাড়ী চড়া, আর মাঝে মাঝে টেকৃচি ভাঁড়ার পয়সা থেকে দু'চার টাকা আয়। মন্দ কি হোল? আর এইত সবে সুরু। এইতেই তো আর থেমে

থাকবে না যোগীন্দ্রনাথের মেয়ে মানসী রায়। আয় বাড়াতেই হবে মানিকে। এ বাড়ী আবার কবে ছেড়ে যেতে হয়। সেই বড়লোকের ছেলে নাকি নালিশ করেছে আদালতে, শম্ভু বলেছে শীগগীরিই উঠে যেতে হবে হয়ত। এই বড় বাড়ীর যে যেখানে যত ঘর সংসার পেতেছে সকলকেই গুটিয়ে নিয়ে 'লম্বা' দিতে হবে, শম্ভুনাথ হেসে হেসেই বলে, কিন্তু কথাটা তো সত্যি, এ বাসা তো একদিন ছাড়তেই হবে। তখন? কি হবে তখন?

কি আর হবে? তখন শম্ভুনাথই ভরসা। ও তো বারবারই বলে, দেখুন না কি করি। আর মাসখানেকের মধ্যেই সিনেমায় নামিয়ে দিচ্ছি মানিকে। শুধু বাড়ী! বাড়ী, গাড়ী, ফোন, ফ্রিজ সব, সব হবে। দেখুন না লেকের ধারে বাড়ী আপনার এই উঠল বলে।

নাঃ। শম্ভুনাথ বলে ভাল। বিড়ির শেষ সুখ টানের মত ওর কথাগুলোয় কেমন যেন নেশা আছে, বারবার শুনতে ইচ্ছা করে যোগেন্দ্রনাথের। বিশ্বাস করতে ভাল লাগে।

কিন্তু আজ কি যে করতে চাইছে শম্ভুনাথ, সেটাই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। এমন বাদলার দিনটাই মাটি। পর্দা টানা ঘরে বসে চপ কাটলেট খেতে খেতে লাখ বেলাখের গল্প শোনা, কি তারিয়ে তারিয়ে চীনে খাবার খেয়ে দোকানের খড়কে দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতেই টেবিলের তলা থেকে হাত বাড়িয়ে শম্ভুর হাত থেকে টাকা নেওয়া, আজ আর হোল না। ট্যাকসি ভাড়া বলে দশটা টাকা অবশ্য আগেই এসে গেছে পকেটে। ভাগ্যিস শম্ভুর কথা শুনে বৃষ্টির ভয়ে আগেই ট্যাকসি চড়ে বসেনি যোগেন্দ্রনাথ। নাঃ। এরকম বোকামী যোগেন্দ্রনাথ অবশ্য কখনই করবে না। আর তাই ভাল মন্দ কিছু আজ পেটে পড়ল না বলে তত আর খারাপ লাগছে না, নগদ দশ টাকা এখনও গরম করে রেখেছে যোগেন্দ্রর বুক পকেট।

বিড়িতে শেষ টান দিয়ে উঠলো যোগেন্দ্রনাথ, শম্ভুর আসার সময় হোল। মানিটা কি আবার রান্নাঘরে ঢুকল নাকি গিয়ে। ভিজে

যাবে তাহলে। এই ফিরফিরে বৃষ্টিতেই ভিজে সপসপে হয়ে যাবে। পুরানো এই ধনীর প্রাসাদে তুখানা ঘর তাদের যোগাড় করে দিয়েছে অবশ্য শম্ভুনাথ, আর ঘরের গায়ে এক ফালি খোলা উঠোন। তার পরই আবার বড় হল ঘরটা নিয়ে নিশীথবাবুর বিরাট পরিবার। নিশীথবাবুর তুই ছেলেই চাকরী করে এখন, নিশীথবাবুও সন্ধ্যায় মাষ্টারি করেন, অর্থাৎ আয় মন্দ নয়। তবুও কেন যে পোড়ো বাড়ীর ভাড়া ঘরে পড়ে থাকেন, কে জানে।

জিজ্ঞাসা করলে নিশীথবাবু হাসেন, বলেন এই রাজপ্রাসাদ ছাইড়া যামু? কোথায় যামু? কই? বস্তি বাড়ী?

নিশীথ বাবু মিথ্যা বলেন না! রাজ প্রসাদই বটে। পোড়ো হোক, ভাঙ্গা হোক, শ্বেত পাথরের মেজে এখনও এক বালতি জল ঢেলে ধুয়ে দিলেই ঝকঝক করে, কালো কাঠের দরজা, জানলা রং পালিশের অপেক্ষা করেনা, সদাই মসৃণ, স্বতই উজ্জ্বল। তবে ঐ কলঘর ইত্যাদি এক, আর উঠোনের ধারে দাওয়ার উপরই রান্নার ব্যবস্থা। বৃষ্টি আসলে জলে ভিজেই রান্না সারতে হয় শৈলবালাকে। তা হোক, একটু জলেই না হয় ভিজল শৈলবালা, তবু এটা বস্তি বাড়ী তো নয়। বস্তির গোলার ঘরে গিয়ে অবশ্য যোগেন্দ্রনাথকে উঠতে হবে না কোনদিনই। আর বছর খানেকের মধ্যেই ঘর ভাড়া দেবার ক্ষমতা মানির আয় থেকে অনায়াসেই হবে। এই তিনটে প্লে করেই তো মানির বেশ নাম হয়েছে এখন। কালই একজন খবর নিতে এসেছিল, আর মনে হয় এমন খবর নেওয়া এখন চলতেই থাকল। হাজার হোক, নিজের মুখে বলতে বাধে, কিন্তু মানির মত সুশ্রী সুঠাম চেহারা, এমন মুখ চোখ,—কই? এত তো ঘোরে যোগেন্দ্রনাথ কলকাতা শহরে, এমন একটা মেয়ে চোখে তো পড়েনি আজও। তবে থাকতেও পারে অনেক 'গোলাপ ফুল পাঁচিলের আড়ালে' শম্ভু যেমন বলে। মানিকেই বা চিনত কে? জানতো কজন? ডাক তো আর এমনি আসেনি, ডাকতে হয়েছে, রীতিমত খাটতে হয়েছে তার জন্য শম্ভুনাথ

কে। ঠিক কথা। চটি দিয়ে ঘষে ঘষে বিড়ির অবশেষটুকু নিঃশেষে নির্বাপিত করল যোগেন্দ্রনাথ, টিনের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, আর আর তখনই ঝনঝন শব্দে শিকল বেজে উঠল আবার।

শম্ভুনাথ। যোগীন্দ্রনাথ গিয়ে দরজা খুলল। এক ঝাঁক উগ্র গন্ধ ছুটে এল যেন। শম্ভুনাথ রোগা ঘাড়ের ওপর রুমাল ঘষতে ঘষতে ঘরে ঢুকল। কি। মানি তৈরী তো।

মনে তো হয়।

মনে হয় মানে। আপনি বলেননি ওকে। বলে দিলাম যে।

হু' হু বলছি। ব্যস্ত কিসের। ন'টা তো বাজে নাই এখনও।

না, বাজেনি বটে, শম্ভুনাথ তপ্ত খাটের ওপর টান করে পাতা বিছানার একধারে সাবধানে বসল। টিনের চেয়ার যদিও আর একটা পাশেই আছে, কিন্তু ওটায় বসতে ভরসা পায়না শম্ভুনাথ। পুরোণ চেয়ারগুলো যেখানে সেখানে ফাঁক। এমন চিমটে ধরেছিল সেদিন, শম্ভুর নতুন ধুতিটাই ছিড়ে গেল। শা-ল-লা। বউবাজারের মোহিত্ত দার গুদাম থেকে একটা কাঠের পুরোনো চেয়ার তুলে আনবে ভেবে রেখেছে অনেকদিন থেকে, হয়ে আর উঠছেনা। ভুলে যায়। বড় বেশী ভুলে যাচ্ছে নাকি আজকাল শম্ভুনাথ? না ভুল ঠিক নয়। সময় কই? একা মানসীর জন্য ছুটোছুটি করতে করতেই তো দিন শেষ। মানসী কি বোঝে এসব কিছু? বোঝে ওর ঐ বোকা বাপটা? কই? কি হোল? শম্ভুনাথ একটু গলা চড়াল, কাকাবাবু। কত দেরী আর?

আরে বসো, বসো তুমি, আরাম কইর‍্যা বসো আমি দেখছি। ঘরের দরজা ঠেলে ভেতরে গেল যোগেন্দ্রনাথ, শম্ভু বালিশের ওপর কনুই রেখে পা তুটো ছড়িয়ে দিল বিছানার ওপর। কাবলী জুতোর ডগা ছুয়ে রইল বিছানার প্রান্ত। ইস। মানসী দেখতে পেলেই হৈ হৈ করে উঠবে। একটু জুতোর ছোঁয়া লেগে বিছানা কি একেবারে অশুদ্ধ হয়ে যাবে নাকি? ঠাকুর ঘর তো আর নয়। মানসীর আবার

সবটাতেই বাড়াবাড়ি। পরিষ্কার, পরিষ্কার একটা বাতিক মনে হয় ওর। আর সর্বদাই নিজেও অবশ্য বেশ ফিটফাট পরিষ্কার থাকে মানসী, আর শম্ভুর তাই ওকে আরো ভাল লাগে। এত পছন্দ হয়। কেমন সুন্দর গোছাল এইটুকু মেয়ে। ছেঁড়া পুরোনো শাড়ী সেলাই করে কেচে পাশের ঘরের নিশীথ বাবুদের গদিওলা পুরু বিছানার তলায় রেখে দেয় পাট করে কাগজে মুড়ে। পরবার সময় বের করে আনে দিবি ইস্তিরি হয়ে যায়। যাই বল, বুদ্ধি আছে মেয়েটার। আর রূপ তো আছেই। হাওড়ার সেই টালি ছাওয়া চটের পর্দা ঝোলা ঘরের মধ্যে মেয়েটাকে দেখেই তো চমকে উঠেছিল শম্ভুনাথ। একি! এমন মেয়ে এখানে? এর যে দশতলা বাড়ীতে থেকে লম্বা আমেরিকান গাড়ী চড়ার কথা। অবশ্য শম্ভুনাথের চোখ বলেই 'আসলটাই' চিনে নিতে পেরেছিল সেদিন। নাহলে, এক বছর আগের সেই হাড্ডিসার 'খুকি' সে এমন লকলকে তাজা লাউডগার মত ফনফনিয়ে উঠবে, সে কি ওর বাপ মাও ভাবতে পেরেছিল? হুঁ হুঁ বাবা। এ শম্ভুনাথের চোখ। ঠিক বুঝেছি শম্ভুনাথ, পেটে একটু ভাল মন্দ পড়লেই এ একেবারে শালা কেউটের বাচ্চা। এখনই ওর মুখ ঝামটায় কি আগুন মাইরি। আরে, তা নাহলে কি আর সুকুমার বিশ্বাস, অধীর হোড় সবাই এত খাতির করতো শম্ভুনাথকে? কি জিনিষ একখানা পাশে নিয়ে ঘোরে আজকাল শম্ভুনাথ দ্যাখ। শালারা চেয়ে দ্যাখ। আরো হবে, আরও রূপ খুলবে। বয়স যত বাড়বে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম পেটে পড়বে তত জেল্লা বাড়বে, শরীর ভরবে। আর সেই আসাতেই তো তো আছে শম্ভুনাথ। সেই ভরা যুবতী রূপসী মানসী তখন ক র? শম্ভুনাথের। হ্যাঁ, শম্ভুনাথ সেই প্রথম দিন থেকেই জানে, মনে মনে ঠিকই করে রেখেছে যে মানসীকেই ও বিয়ে করবে। এতদিন, কোনও মেয়েকে দেখেই শম্ভুনাথের মনে বিয়ের সখ জাগেনি। সত্যি বলতে কি মেয়েদের যে আবার বিয়ে করে বৌ সাজিয়ে ঘরে নিয়ে যেতে হয়, এ যেন শম্ভুনাথ ভুলেই গিয়েছিল।

মেয়ে দেখিয়ে কাজ পেতে হয়, ফিল্ম ষ্টুডিয়োয় পৌঁছে দিয়ে দু'দশ টাকা পাওয়া যায়, আর তেমন তেমন হলে হোটেলের ঘরে দু'চারটে মেয়েক তুলেও দিয়ে এসেছে শম্ভুনাথ? মেয়েরা তো 'মাল'। খালি ইধার সে উধার কর, আর টাকা কামিয়ে নাও পকেটে ঝমাঝম।

কিন্তু মানির বেলাতেই কেমন যেন একটু গোলমাল লাগে শম্ভুনাথের। ওদের অভাব, ওদের দুঃখ ঘোচাবার জন্য মানিকে ও এধার ওধার নিয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু কড়া নজর রাখে সর্বদা, যাতে হাত ফসকে বেরিয়ে না যায়। মানি অবশ্য এসব কিছুই জানে না, শম্ভুর মনের কথা ও জানবে কি করে? বলবে, মনের কথা ওকে খুলে বলবে বইকি শম্ভুনাথ, তবে আরও কিছুদিন যাক, অবস্থাটা ওদের আরো একটু ভালো হোক, ফিলম কনট্রাক্ট হোক দু'একটা, তখন একদিন, একদিন। ঠিক করে বলবে কথাটা, কি ভাবে পাড়বে বিয়ের প্রস্তাব, সেটা এখনও শম্ভুনাথ ভেবে ঠিক করতে পারেনি, তবে মানি যে রাজী হবেই তা শম্ভুনাথ জানে। মানি মানুষ ভাল, একটু রাগী বটে, কিন্তু অকৃতজ্ঞ নয় শম্ভু তো আর কম করেনি ওদের জন্য। সে কি আর মনি ভুলে যাবে? আর শম্ভুর চেহারাটাও এমন কিছু খারাপ নয়। একটু বেশী রোগা, এই যা। ও বিয়ের পরে মানির হাতের যত্ন আত্তি পেলে রূপ খুলবে শম্ভু চন্দ্রেরও। আর তখন তো আর এত ছুটোছুটি দৌড়-ঝাঁপ করতে হবে না শম্ভুনাথকে। মানির ফিলমের টাকা থেকেই নিজের নামে প্রোডাকসান করবে শম্ভুনাথ। তখন আবার যোগেন্দ্র-নাথ ভাগ চাইবে নাতো? কে জানে। বাপ ব্যাটা তেমন সুবিধের মনে হয় না শম্ভুনাথের। কেমন খোলা খোলা চোখে তাকায় দ্যাখনা। মনে মনে একটু যেন ভয়ই পায় শম্ভুনাথ, কিন্তু না। মনে হয় না ওর অত সাহস হবে। আরে, ওসব বাপ-ফাপ ঢের দেখা আছে শম্ভুর। বোতল ধরিয়ে পকেটে দশ টাকা বেশী গুঁজে দাও, সব ঠাণ্ডা। মনে নেই, ছবি ঘোষের কথা। বাপটা সঙ্গে থাকতো সব সময় ঠিকই, কিন্তু থাকত কোথায়? এক পাঁইট নিয়ে বসে থাকত নীচে, মেয়ে

উঠে যেত উপরে হোটেলের ঘরে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। মেয়ের রোজগারে শেষ পর্যন্ত সোনারপুরে তিন কাঠা জমি পর্যন্ত কিনে ফেলল বাপটা, কে জানে এতদিনে বাড়ী পর্যন্ত তুলে ফেলেছে কিনা। পাটনা না কোথায় গেল যেন কাদের সঙ্গে, তারপর থেকে ছবি ঘোষের আর কোনও খোঁজ পায়নি শম্ভুনাথ। ভালই আছে নিশ্চয়, বড়লোক হয়ে গেছে এতদিনে। না-না-না। শুধু শম্ভুরই এখনও পর্য্যন্ত কিছু হোলনা। হাত ধরে যাদের নিয়ে এল, হাত ছেড়ে তারা কোথায় চলে গেল ; টাকা-পয়সা, রূপ, ঐশ্বর্য্য হোল কতজনের হোল কেরিয়ার ? আর শম্ভুনাথ, যে তিমিয়ে সেই তিমিরে। তবে না, এবার আর ছাড়বে না শম্ভুনাথ, মানসীকে আর হাত ফসকে পালাতে দেবে না। ছবি ঘোষের মত হোটেলের ঘরেও কোনদিন মানসীকে তুলে দেবে না, পাঁক ঘাঁটতে হবে না মানসী সিকদার, শম্ভুনাথ সিকদারের বউকে। একেবারে সিনেমার হিরোইন। আজ এত আয়োজন। মিঃ ভোঁসের কথা মত চললেই সব ঠিকঠাক। হিন্দি গানের সুর গুনগুনিয়ে উঠল শম্ভুনাথের বুকে, মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে পায়ে পা দিয়ে তাল ঠুকতে সুরু করল ও, আধ খাওয়া সিগারেটটা জানলা গলিয়ে বাইরে ফেলে বিছানার ওপর উঠে বসল। আর তখনই ভেতরের দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল মানসী।

শম্ভুদা, আবার। মানসী প্রায় ধমকে উঠল। আবার তুমি জানলা দিয়ে জলন্ত সিগারেট ফেলেছ ?

ফেলেছি তো হয়েছে কি ? টিপটা দ্যাখ। জানলা গলিয়ে এক্কেবারে ঠিক টগর গাছটার গোড়ায়। ঘরে তো আর ফেলিনি।

ঘরে পড়তো যদি। টিপ ফসকাতে পারে তো ? তাহলেই একটা অগ্নিকাণ্ড।

টিপ তো শালা সারাজীবন ফসকেই গেল, মনে মনে খুব হাসি পেল শম্ভুনাথের, কিন্তু অগ্নিকাণ্ড তেমন একটা আজ অবধি হয়নি,

তবে হ্যাঁ, আজকের টিপটা আর ফসকাতে দিচ্ছে না শম্ভুচন্দ্র। এবারে নির্ঘাৎ পার্টি বধ। আর পার্টির মত পার্টি বটে মিঃ ভোঁস। কি চেহারা, আর কথা। আহা! অত বড় লোকটার মুখের কথা নয়ত যেন ঠাণ্ডা শরবৎ। মানসীর দিকে ফিরে খুব নরম করে হাসল শম্ভুনাথ। কেন ওসব মিছে ভয় পাচ্ছ বলোতো মানি। এ শর্মার সিগ্রেটে ওসব অগ্নিকাণ্ড-ফাণ্ড হবে না। নেভার।

না, হবে না আবার। সেবার শান্তিদির গায়ে পড়েনি তোমার ছুড়ে ফেলা সিগ্রেটের টুকরো।

গায়ে কোথায়? ধুর। পায়ের কাছে মাটিতে পড়েছিল, তাইতেই বুড়ি মাগী একেবারে হাউমাউ করে।

ফের শম্ভুদা। মানসীর চিৎকারে থতমত খেয়ে গেল শম্ভুনাথ। কি, কি কি···

আবার ঐসব অসভ্য ভাষা বলছ তুমি।

অসভ্য ভাষা। শম্ভুনাথের মুখে কড়া কথা এসেছিস একটা; কিন্তু না। এখন এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে সময় নষ্ট না করাই ভাল, আর যা মেজাজ মানির, একবার যদি বিগড়োয়, দরকার নেই বাবা মহারাণীকে চটিয়ে, খামোখা লেট হয়ে যাবে হয়ত। কিন্তু কি আস্পদ্দা দেখেছ? বলে কি না অসভ্য ভাষা। মাইরি আর কি? নিজেরা তো ঘরে দিনরাত্তির খাঁউ মাউ করছে, আর যত দোষ নন্দ ঘোষ। কেনরে বাবা, বাড়ীতে মা, কাকীমা তো সব সময়ই, এই কি মাগীটার রকম সকম দ্যাক, বুড়ী মাগীর ন্যাকাপনা ইত্যাদি বলেই থাকে, তারা সব অসভ্য নাকি? ইঃ। কি এলেন সব একেবারে, ধুত্তোরি।

যোগেন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকল। একি। তোরা এখনও যাস নাই।

ঐ যে আপনার মেয়ে। শম্ভু তাড়াতাড়ি বলল খালি খালি যত বাজে কথায় সময় নষ্ট করছে।

বেশ করেছি। চটির ওপর ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো দিয়ে ধুলো ঝাড়ছিল মানসী, কথাটা চেঁচিয়ে প্রায় ধমকের সুরেই বলল।

আঃ খুকি। যোগেন্দ্রনাথ মেয়ের পিঠে হাত রাখল। শম্ভুদা তোর দাদা হয়না। বড় দাদার সাথে এমন ভাবে কথা বলে নাকি। মাইন্ড করতে হবে না।

আহা। আমি বুঝি শুধু শুধু রাগি, শম্ভুদা খালি খালি ঘর নোংরা করে আর বললেই যত আজে বাজে কথা।

চটি মাটিতে ফেলে পায়ে গলাল মানসী, বলল বাবা দরজাটা দাও, আমরা তাড়াতাড়িই আসব যদিও, তবু তুমি শুয়েই পোড়ো, শরীর খারাপ বলছ, বেরুতেই পারলেন।

যোগেন্দ্রনাথ চেষ্টা করে কাশল, একটু জড়িত স্বরে মেয়ের কথার জবাব দিল। হ্যাঁ, ভাল নাই আজ শরীরটা কেমন জ্বর জ্বর লাগছে যেন।

তাইতো বলছি। মানসী কাছে এসে বাবার গালে কপালে হাত রাখল। নাঃ। জ্বর আসেনি এখনও, তবু বলা যায়না, বদলার দিন, হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। আর ঠাণ্ডা লাগলেই আবার তোমার হাঁপানীর টান সুরু হয়ে যাবে। সাবধানে থেক।

বাবার গলার কাছে বোতামটা আটকে দিয়ে ঘর থেকে বেরুল মানসী, শম্ভুনাথও বেরিয়ে গেল। আর মেয়ের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ যোগেন্দ্রনাথের চোখে জল এল। দেব পূজার নির্ম্মাল্য মেয়েটা আমার এত ভাল, এত সরল। লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে ময়লা সার্টের কোণে চোখ মুছল যোগেন্দ্রনাথ। হা ভগবান। কি আছে তোমার মনে, তুমিই জান। কোথা থেকে ঠেলে ঠেলে কোথায় নিয়ে আসছ। কোন অপরাধে। কি অপরাধ করেছিল নিশ্চিন্দিপুরের রায় বাড়ীর যোগীন্দ্রনাথ? দেশ থেকে যুবতী স্ত্রীর হাত ধরে যখন পালিয়ে এসে ছিল এক বস্ত্রে, তখনই বা কি সম্বল ছিল ওর? বউ ছাড়া আর কিই বা আনতে পেরেছিল সাথে? বাড়ী জমি জমা, গোরু, বাছুর কাপড় বাসন সবইতো ফেলে এসেছিল সেখানেই পাকিস্তান হবার পরও সেখানে বাস করেছিল কয়েক বছর।

কি দুর্গতি হোল যে, আর দুর্গতিই বা বলে কেমন করে। পঠান পুলিশগুলো রোজ রোজ সেভাবে গাড়ীতে আসত ওদের অসুবিধা কিছু হচ্ছে কিনা জনতে। আবার দাঙ্গার মুখেই তাই পালিয়ে এল করিম চাচার পরামর্শে। বুকে তখন সাহস ছিল, দেহে ছিল বল। রিফি-উজি কলোনিতেও যায়নি যোগীন্দ্রনাথ, ইষ্টিশানেও পড়ে থাকেনি দিনের পর দিন। দস্তুরমত কারখানায় ভাল কাজ জুটিয়ে বাসা ভাড়া করে স্ত্রী পুত্র কন্যাদের আরামেই রেখেছিল অনেক অ-নে-ক দিন।

কপাল। শুধু কাজ পেলনা, হাতটাও জখম হোল বাস থেকে পড়ে। না হলে কি আর। কোঁচার খুট দিয়ে টুলটা ঝেড়ে জানলার তলায় টুলের ওপর বসল যোগীন্দ্রনাথ।

এই ভর সন্ধ্যা কালে শম্ভুর সাথে মেয়েটাকে যে ছেড়ে দিল একা একা……

অবশ্য শম্ভু ছেলে ভাল। এতদিন তো দেখছে ওকে। না, কোন বেতমিজি দেখা যায় নাই কোনদিন। আর খুকিকে নিজের বোনের মতই স্নেহ করে। এটা খাও, ওটা খাও, স্নো পমেটম কিনে দিচ্ছে নিত্য নিত্য—সাজ ভাল করে। মেয়েটাও সাজতে শিখেছে বটে, আজ কাল। রং চং মেখে উঁচু হীলের টোক্কর তুলে তুলে মেয়ে যখন রাস্তা হাঁটে, কে বলবে ও যোগীন্দ্রর মেয়ে। মনে হয় গ্রামের সেই জমিদার বাবুর কলেজেপড়া মেয়ে বুঝিবা। আর অতবড় প্রতাপশালী জমিদার বাবুরই বা কি হোল? সেই কলেজে পড়া দিদিমণিই তো কোথায় জানি চাকরী করে, সংসারই চালায় নাকি সেই। তবে, মেয়ের রোজকারে খায়না এখন জমিদার মশাই? দোষ অইল খালি যোগীন্দ্রর বেলায়? হু।

যোগীন্দ্রনাথ উঠল, আড়মোড়া ভাঙ্গল। অবশ্য মেয়ের মারে যেমন বলে, সে অইল লিখা পড়ার কাজ, তাতে সমমান কত। আর তোমাগো তো খালি মাইয়াটারে নাচাইবার মতলব। তা নাচানো ছাড়া করবেটা কি? খুকি কি বি, এ, এম, এ পাশ করেছে জমিদার

বাবুর মেয়ের মতো? মেয়ের মা আরও বলে, বিয়্যা দাও, ভিক্ষা-সিকা কইর‍্যাও। মেয়ের বিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন।

পাগল। ধার দেনা ভিক্ষে করে নাহয় মেয়ের বিয়েটা দিয়েই দিল যোগীন্দ্রনাথ; সুন্দরী মেয়ে, বিয়েটা হয়ত হয়েই গেল, ভাল ঘর বরেই পড়লো মানসী, কিন্তু তারপর? তারপর কি? আঙ্গুল চুষুম? যোগীন্দ্রর তো আর মাথা খারাপ হয়নি, যে মানসীর বিয়ের চেষ্টা করবে। বরং মানসীর বিয়েটা যাতে হঠাৎ না ঘটে যায় সেই দিকেই প্রখর দৃষ্টি রাখছে আজকাল মানসীর বাবা। চার চোখ খুলে রেখেছে সে, কোন ব্যাটা যাতে মেয়ের কাছে ঘেঁসতে না পারে। এক সুন্দরপানা ছোকড়া তো ঘুরঘুর সুরু করেছিল সেই অফিস ক্লাবের রির্হাসালে। থিয়েটারে পার্ট ছিল না ছোঁড়াটার, তবু রোজ তার রির্হারসালে আসা চাই। কেন রে বাপু? এত কিসের? কিন্তু যোগীন্দ্রর চোখকে ফাঁকি দেওয়া এত সহজ নয়। ঠিক ধরেছে ছোকরার চোখ কোন দিকে? তারপর থেকে রিহারসলে কদিন আর মেয়ের মেয়ের পাশ ছাড়ে নি যোগীন্দ্রনাথ। ছেলেটা দুদিন খাওয়াল চীনে বাড়ীতে। একদিন সন্দেশ, রাবড়ি আরো কত যেন কি 'মাসীমার জন্য' দিল যোগীন্দ্রর হাতে, চলছিল ভালই, কিন্তু সিনেমার সেই কায়দা করে মানসীর একপাশে নিজে বসে, আর এক পাশে শম্ভুনাথকে বসাল যোগীন্দ্রনাথ, ব্যস। পরদিন থেকেই আর দেখা নাই ছোকরার। ভালই হোল। আপদ বিদায় হোল। মানসীর মুখটা অবশ্য 'শুকন-শুকন' লেগেছে কয়েকদিন। 'রিহারসালের সময়' যোগীন্দ্র ভাল করেই লক্ষ্য করেছে মেয়ের চক্ষু দুটি দুটি পক্ষীর মত উড়ে উড়ে খুঁজেছে সেই সুন্দর ছোকরাকে কিন্তু না, সে আর আসেনি। মেয়েটার মনে কি দুঃখ হয়েছিল? কষ্ট পেয়েছিল মানসী? কিন্তু উপায় কি? যোগীন্দ্র নাচার।

কিন্তু কতদিন ঠেকাবে যোগীন্দ্রনাথ? এরম কত ছোকরা ছড়িয়ে

আছে এই কলকাতা শহরে কতজনকে ঠেকাবে 'পঙ্গু, অক্ষম মানসীর বাবা ?

নাঃ। পারবেনা। একদিন কোথায় কি লটঘট বাধিয়ে বসবে মেয়ে, তখন যোগীন্দ্রর মাথায় হাত। ছোট মেয়েটা সেয়ানা না হয়ে ওটা পর্য্যন্ত হে ভগবান, তুমি দেখো, মেয়েটা যেন বিয়া শাদী করতে না চায়। ছোট ছেলেটাকে ভাল করে মানুষ করতে হবে। লেখা পড়া শিখে বিলাত যাবে সে, উকিল বাবুর ছেলের মতন ব্যারিষ্টার হবে যোগীন্দ্রর ছেলে, এই একটি সাধ ওর মনে, কে জানে ভগবান আশা পুরাইবেন কি না।

হ্যাঁ। ছেলে বড় হোক, হোক উকিল কি ব্যারিষ্টার, আর বাড়ী হোক একটা যোগীন্দ্রনাথের, বড় নয়, ছোট একতলা বাড়িই একটা করে দিক আগে মানসী বাবাকে, তারপর যাকে ইচ্ছা 'বিয়্যা' করুক, যেখানে খুশী থাক, কথাটি বলতে আসবেনা যোগীন্দ্রনাথ, তেমন বাপই নয় সে। আর ততদিন খোকা যতদিন না মানুষ হচ্ছে, কলকাতা শহরে যোগীন্দ্রর বাড়ী না উঠছে, ততদিন ছুটি নাই মানসীর, ছুটি নাই এ সংসার থেকে।

আর শম্ভুনাথও তো দিনরাত এই কথাই বলে, বলে নিশ্চয়। এতো মানসীর কর্ত্তব্য। আগের বাড়িটা আপনার নামে, দ্বিতীয় বাড়িটা মানসীর নামে। আর নাহলে তো ইনকাম ট্যাক্সে ধরবে।

সেইতো। উৎসাহিত হয় যোগীন্দ্রনাথ, না অইলে চলবে ক্যান ?

মাঝ পথে বাধা দেয় মানসী স্বয়ং।

না, ট্যাকস ফাঁকি দেবনা আমি কখনও। আয়কর ফাঁকি দেওয়া অপরাধ. আমাদের স্কুলের শৈলদি বলেছেন। এটা ক্রাইম ? জান।

কারাইম ? যোগীন্দ্রনাথ মুখ ভেংচিয়েছে মেয়েকে বিশ্রীকরে, উনি আমারে কারাইম শিখাইতে আসছেন। আমারে আর তোর

পাপ, পুণ্য শিখাইতে লাগব না। কারাইম? বলি ভাত মারণের বেলা তো এক পাথর, কারাইম তখন যায় কুথায়?

এরপর আর একটি কথাও বলেনি মানসী, ছলছল চোখে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেছে। আর রসিদ দেওয়া টাকা নেওয়া তো যোগীন্দ্রনাথই করে বরাবর। মানসী কোনও দিন কথাটি পর্যন্ত বলে না। হাত পেতে এক আধলা পয়সা নেয়নি কখনও। কিন্তু, হঠাৎ চমকে উঠল যোগীন্দ্রনাথ, আজ কি হবে? টাকা কড়ি আজ কার হাতে দেবে ওরা?

প্লে নয়, রিহারসাল নয়, সিনেমায় নামাবার জন্য যখন ওদের হোটেল, রেষ্টুরেণ্টে নিয়ে যায় শম্ভুনাথ, প্রোডিউসারকে কি ডিরেক-টারকে মানিকে দেখানর জন্য, তখন তো ফেরার আগেই যোগীন্দ্রর হাতে ত্রিশ, চল্লিশ এমন কি পঞ্চাশ টাকাও গুঁজে দিয়েছে শম্ভুনাথ। টাকাটা অবশ্যই শম্ভুনাথের নয়, সেই সব ডিরেকটার প্রোডিউসারেরই আর শম্ভুনাথ তো স্পষ্টই বলে, যতদিন 'সলিড' কিছু না হচ্ছে, ততদিন অন্ততঃ চলুক এই ভাবেই, যা পাওয়া যায়। কি বলেন কাকাবাবু।

সে তো ঠিকই। যোগীন্দ্রনাথ মাথা নাড়ে। কিন্তু আজ কি হবে? আজ কি শম্ভু ফিরে এসে তারপর টাকা দিয়ে যাবে? আর আজ টাকার অঙ্কটা একটু ভারীই হবে মনে হয়। কেন, কেন বেশী যোগীন্দ্রনাথ? কেন? ক্যান! এই বাদল রাতে একা ছাড়ছিনা আজ যুবতী মাইয়্যাটারে, চমকে উঠল যোগেন্দ্রনাথ, কি কইলাম, কি কইলাম ভগমান। ছটফট করে উঠল যোগেন্দ্রনাথ নিজের মুখের বলা কথাটা, না, না, না বলে ফিরিয়ে নিতে চাইল, কিন্তু উৎক্ষিপ্ত শরের মত শব্দগুলো তখন ঝনঝন বাজছে ওর মাথার মধ্যে, ওকে অস্থির করে তুলল। ঘন ঘন পায়চারী করল যোগীন্দ্রনাথ ঘরের মধ্যেই; ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি নামল জোরে। খোলা জানলা দিয়ে বৃষ্টি ঝরা আকাশ আর জনহীন রাস্তা দেখতে দেখতে হঠাৎই যোগেন্দ্রনাথের চোখের সামনে, বহু দিন পরে ভেসে উঠল সেই ছবি। তার দেশ আর বাড়ী

নিজের ভিটা। সেই সব জল ভরা মাঠ আর নিজের নিশ্চিন্ত শিশু-কাল মনে পড়ে দুঃখ নয়, কষ্ট নয়, কেমন উদাস বুঝিবা ঈষৎ বিরক্ত বোধ করল যোগীন্দ্রনাথ। আর হঠাৎ তার রোগা হাতের মুঠি পাকিয়ে জোরে জোরে বলল, না, মেয়েকে আর কোনদিন একলা ছাড়বোনা, কোনদিন নয়। স্থির প্রতিজ্ঞা যোগীন্দ্রনাথের। মনস্থির করে মন শান্ত হোল, আস্তে আস্তে জানলা বন্ধ করে ঘড়ি দেখল, দশটা বাজে। মানসীর মা নিশ্চয় ফিরেছে এতক্ষণ, খেতে দাও বলার জন্য ধীর পায়ে ভেতরে গেল যোগেন্দ্রনাথ।

বাইরে এসে মানসী অবাক, ট্যাকসি কই শম্ভুদা। তবে যে বাবা বলল, তাড়াতাড়ি কর, মিটার চড়ছে।

মানসীকে কথা শেষ করতে দিল না শম্ভুনাথ আহা, আগে বেরিয়েই দ্যাখনা গাড়ী এনেছি কিনা।

এনেছে তো বাড়ীর সামনে দাঁড় করাওনি কেন? একে অন্ধকার, তায় বৃষ্টির দিন।

এখন তো জল ধরে গেছে, মোলায়েম ঠাণ্ডা স্বর শম্ভুনাথের। তাছাড়া এই গলির ভেতর ঢুকবেনা এত বড় গাড়ী।

গলি। ভ্রূ কোঁচকালো মানসী। তুমিই তো বল যে রাজ প্রাসাদে এনে তুলেছ আমাদের।

সে তো মিথ্যে বলি না, কিন্তু বড় রাস্তা তো নয় এটা, একটু ভেতর দিকে তো।

কিন্তু ট্যাকসি তো ঢোকে সব সময়ই।

হ্যাঁ, ট্যাকসি অবশ্যই ঢোকে, শম্ভুনাথ টিপে টিপে হাসছিল।

তবে।

এস, এস। শম্ভুনাথ মানসীর হাত ধরে সরু রাস্তা ছেড়ে বড় রাস্তায় পড়ল। বিরাট এক ঝকঝকে রাজহাঁসের মত ঢেউ তোলা বড় গাড়ীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে ধরে মানসীকে আহ্বান জানাল, এস।

এই গাড়ী? মানসীর যেন বিশ্বাস হচ্ছে না, এই গাড়ী তুমি এনেছ শম্ভুদা? এতো প্রাইভেট কার। কোনও বড়লোকের গাড়ী হবে নিশ্চয়।

হ্যাঁ রে বাবা হ্যাঁ। বড়লোকের বলে বড়োলোক। সারা কলকাতা শহরটাই কিনে নিতে পারে মিঃ ভোঁস, এত বড়লোক।

কলকাতাটাই কিনে নিতে পারে, বল কি? এত বড়লোক। গাড়ীর নরম আরামে ঢুকে যেতে যেতে মানসী বিহ্বল হোল। একি গাড়ী শম্ভুদা। নাঃ। তোমার ভোঁস সাহেব সত্যিই বড়লোক।

হুঁ হুঁ। তবে এ হোল শম্ভুনাথের কনট্যাকট, যে সে ব্যাপার নয় তো। এমন গাড়ী চড়েছো জীবনে কখনোও।

চড়বো কি? দেখিইনি। তুমি তো খালি ট্যাকসি চড়াও, প্রাইভেটকার আর কই চড়লাম। বল শম্ভুদা।

কেন? চড়েছো বইকি। সেই যে মিঃ বোসের গাড়ী চড়ে তিনচার দিন গঙ্গার ধার গড়ের মাঠ ঘুরলাম আমরা। সেই যে সুশোভন বোস। মনে নেই?

হ্যাঁ, ওর প্রাইভেটকারে চড়েছি। প্রায় শুনতে না পাওয়ার মত করে বলল মানসী। গলার কাছে আটকে এল, চোখ ভরে এল জলে। হাঁ, সেই সুন্দর চেহারার সুশোভন বোসের গাড়ী চড়েছে বইকি মানসী, তিনচার দিন নয়, আরো অনেক, পনেরো কুড়ি দিন চড়েছে বোধহয়, বাবা শম্ভুদা সেসব জানেও না।

লেকের পাশ দিয়ে যেতে যেতেই দেখা হয়ে গিয়েছিল একদিন, উনি অবশ্য বলেছিলেন মানসীকে বলেছিলেন মানসীর বাড়ীই খুঁজছিলেন উনি। তারপর আর বাড়ী না গিয়ে মানসীকে পাশে বসিয়ে একেবারে সোঁ সোঁ উধাও, কোথায় কোথায় কতদূরে। গাড়ী থামিয়ে গাছের তলায় বসে চা খেয়েছে দুজনে, গরম তেলে ভাজা খেয়েছে শাল পাতায়, আর গল্প, গল্প, গল্প। সুশোভনের কথা যেন আর থামতেই চায় না মানসীকে কাছে পেয়ে। কত কি কথা যে বলে যেত অনর্গল, কত রঙ্গীন ছবি—মানসী বৌ হবে, সিঁদুর পরে সুশোভনের ঘর করবে, এসব ক্লাবের থিয়েটার ওকে আর করতে দেবে না সুশোভন। বাঃ। আমাদের সংসারটা তাহলে চলবে কি করে। চলবে, চলবে। এক হাতে ষ্টিয়ারিং আর এক হাতে মানসীর মুঠি চেপে ধরেছিল সুশোভন। সব ভার নেবো আমি নেবো মানসী, সব আমি দেখবো। শুধু তুমি…

হঠাৎ গাড়ী থামিয়ে মানসীর ওপর প্রায় উপুড় হয়ে পড়েছিল সুশোভন, ওর গালে ঠোঁটে চুমু খেতে খেতে বার বার বলছিল ভালবাসি, তোমাকে আমি ভালবাসি মানসী।

মানসীর বলতে ইচ্ছা করছিল, আমিও, আমিও তোমায় ভালবাসি, কিন্তু গলা দিয়ে কিছুতেই কোনও আওয়াজ বেরোয়নি মানসীর, গভীর সুখে গলা বুজে এসেছিল, চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। আরো একটু কাছে টানার চেষ্টা করেছিল সুশোভন, মানসীর বুকের ওপর রাখা দুই হাতের আড়াল সরিয়ে এক হয়ে মিশে যেতে চেয়েছিল বোধহয়, আর কি এক অজানা সুখে, যন্ত্রণায় শরীর অবশ হয়ে থাকলেও মানসী আর কাছে আসতে দেয়নি সুশোভনকে, শক্ত করেছে বুকের ওপর দুই হাত, সরে বসেছে। সুশোভনও সরে বসেছে। মানসীর কপাল থেকে এলোমেলো চুলের গোছা সরিয়ে দিয়েছে খুব স্নেহ ভরে, বলেছে, পাগলী। লেকের কাছে নামিয়ে দেবার সময় বলেছে, কাল দেখা হবে। আর তারপর দিন সত্যি দেখা হয়েছিল তাদের। সিনেমায় গিয়েছিল সবাই একসঙ্গে। সেদিন যদিও কথা হয়নি কিছু, কিন্তু চোখে চোখে হেসেছিল ওরা। আর তার পরদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত আর একবারও দেখা পায়নি ও সুশোভন বোসের। একেবারে উধাও হয়ে গেল মানুষটা ? নিশ্চয় কোন অসুখ-বিসুখ করেছে। প্রথম প্রথম ভাবত মানসী। কঠিন রোগ হয়ত কোন। মানসী মিথ্যেই ভেবে মরছে। সেরে উঠেই নিশ্চয় সটান চলে আসবে সে মানসীদের বাড়ী। ঝনঝন করে শিকল বেজে উঠবে, বাবা কি শম্ভুদা মনে করে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দেবে মানসী, আর দেখবে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে।

অনেক দিন, অনেক দিন এইসব ভেবেছে মানসী, আর তাই দরজার শিকল বেজে উঠলেই দরজা খোলার আগেই ছুটে গিয়ে মুখটা দেখছে মানসী, চুলে একবার চিরুনী দিয়েছে, জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিয়েছে ঠোঁট।

আঃ। কি নরম গদি রে। শম্ভুনাথের গলার আওয়াজে কোন

দূর থেকে হঠাৎ যেন এই মস্ত গাড়ীর ছায়া ছায়া আলোয় নিজেকে দেখতে পেল মানসী। কোথায় সুশোভন? সেই ছোট্ট হালকা নীল গাড়ীটা তো নয়, এ যে মস্ত এক রাজহংস, তার ঠাণ্ডা বুকের ভেতর নরম নীল আলোয় মুড়ে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে মানসীকে। পৌঁছে দেবে কোন স্বর্গলোকে কে জানে।

আঃ। একে বলে গাড়ী। শম্ভুদাকে আবার বলতে শুনলো মানসী। বুঝলে মানি। সামনে পা ছড়িয়ে দিয়ে বললো শম্ভুনাথ, এই রকম গাড়ী তোমায় করতে হবে।

আমায়। আমি কিনবো এরম গাড়ী।

নিশ্চয়। একশ বার। আরে সেই জন্যইত আজ নিয়ে চলেছি তোমায়। দ্যাখনা, আজ থেকে কেমন আমাদের ভাগ্য খুলে যায়।

এই নতুন থিয়েটারে?

থিয়েটারে? ফুঃ। শম্ভুনাথ বাঁহাত নেড়ে যেন অনুপস্থিত মাছি তাড়াল। সিনেমা, সি-নে-মা। বেশ করেছেন মিঃ ভোঁস তোমাকে নিয়ে, আর আমি, আমি প্রডিউসার।

তুমি প্রডিউসার? মানসীর বিস্মিত কণ্ঠে সম্ভ্রমের সুর। ইস শম্ভুদা, সত্যি। ওমা কি মজা। হ্যাঁ, শম্ভুদা, আমি তাহলে হিরোইন হবো তো?

নিশ্চয়ই। তবে কি অমনি অমনি এত ছুটোছুটি করছি আমি আজ তিনমাস ধরে?

তি-ন-মা-স ?

তবে। কম কাঠ-খড় পোড়াতে হয়নি মিঃ ভোঁসকে পাকড়াবার জন্য।

কি করে হোল?

অনেক কাণ্ড করতে হয়েছে। এক ফাঁকে তোমাকে দেখিয়েও দিলুম।

আমাকে! মানসীর যত্নে আঁকা ভ্রু দুটি বিস্ময়ে আরও বাঁকা

আরও সুন্দর দেখাল। কই! কবে আবার আমায় দেখলেন মিঃ ভোঁস? আমি তো কিছুই জানিনা।

ঐ তো মজা। শম্ভু মাথা নেড়ে টিপে টিপে হাসতে থাকল। শম্ভুনাথের ডান হাতের কাজ বাঁ হাতে জানতে পারে না, তুমি বুঝবে কি করে?

বলনা শম্ভুদা। আবদারে মেয়ের আহ্লাদী গলায় অনুনয় করল মানসী! মিঃ ভোঁস কখন দেখলেন আমায়, বলনা।

দেখলেন প্রথম ঐ সিংঘানিয়া অপিস থিয়েটারে, আর তারপর···

ওঃ। উনি বুঝি ঐ অফিসের বড় কেউ? ম্যানেজিং ডিরেকটার বুঝি?

আরে না, না। ওসব ম্যানেজিং ডিরেকটার-ফার তুচ্ছ ব্যাপার। মিঃ ভোঁসের সব বড় বড় ব্যাপার। যাকে বলে ইণ্টার ন্যাশানাল। পৃথিবী ছড়ান সব ব্যবসা ওঁর। জাহাজ আছে, তেলকল আছে, লোহার ব্যবসা। কি যে নেই ওঁর। ওখানে থিয়েটার দেখতে নেমতন্ন করেছিল ওঁকে কেউ আর ফিল্ম করবেন বলে উনি নতুন ট্যালেণ্ট খুঁজছেন। উনি বলেন, সব নতুন মুখ নামাব, একেবারে নিউ ব্লাড! ও সব বড় বড় ষ্টারদের পায়ে ধরা মিঃ ভোঁসের পোষাবে না। উনি যাকে নেবেন, একেবারে 'একস্‌ক্লু্‌সিভ করে নেবেন। মানে কপাল তার খুলে গেল আর কি। বুঝলে। মানসীর দিকে ফিরে বেশ একট গর্বের হাসি হাসল এবার শম্ভুনাথ। মাথা হেলিয়ে দিল পেছনের গদিতে।

মানসী বুঝল। 'একস্‌ক্লু্‌সিভ' মানে ভালই বোঝে মানসী, অর্থাৎ তাকে আর অন্য কোন কোম্পানীতে কাজ করতে দেবে না। আর তার মানেই বাঁধা মোটা মাইনে, বাঁধা হিরোইন। আর, আর দ্রুত উন্নতি। কেরিয়ারে উন্নতি, অবস্থার উন্নতি, পোষ্টারে মানসীর মুখ, কাগজের পাতায় পাতায় মানসীর ছবি, সাজানো বাড়ী, গাড়ী, সব, সব। মানসী কিছু বলতে চাইল, প্রকাশ করতে চাইল তার কৃতজ্ঞতা,

কিন্তু কোন স্বর বেরুল না মানসীর গলায়, অস্পষ্ট প্রায় আর্তনাদের মত একটা আওয়াজ বেরুল শুধু।

বিহ্বল মানসীর দিকে বাঁকা চোখে চাইল শম্ভুনাথ। হুঁ। ওষুধ ধরেছে। গাড়ীতে চড়েই অর্দ্ধেক পথ আগিয়ে আনা হয়েছে, ভোঁসের ফ্ল্যাটে গেলে একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে যাবে। তবে, ডান হাতটা পকেটে একবার ঢোকাল শম্ভুনাথ। আগাম ভাল টাকাই যদিও নিয়েছে শম্ভুনাথ মানসীকে একা ফ্ল্যাটে নিয়ে আসার জন্য, কিন্তু মিঃ ভোঁস তাকে কথা দিয়েছেন, পরিষ্কার বলেছেন, আরে না, না। একটু কথা বার্ত্তা, একটু গল্প-সল্প করেই ছেড়ে দেব ওকে। তুমি ভাবছ কেন? তুমি যাকে বিয়ে করবে একদিন, তাকে নিয়ে কখনও যা তা করতে পারি আমি। একেবারে শম্ভুর মনের কথাটা বলেছেন মিঃ ভোঁস। মানসী একদিন ওর বৌ হবে, স্ত্রী হয়ে বাস করবে ওর সঙ্গে ওর বাড়ীতে, আর তাই জন্যইত এত আগলে আগলে রাখে ও মানসীকে। না হলে এমন একটা মেয়েকে, একে নিয়ে ছবি ঘোষের মত যদি লোফা লুফি খেলতো তবে শম্ভুকে আজ পায় কে? টাকার গদির ওপর বসে থাকতে পারত। কিন্তু মানসীকে যে শম্ভুনাথ বিয়ে করবে। মিঃ ভোঁস আরও বলেছেন, দ্যাখনা তোমাদের বিয়েটা আমিই দিয়ে দেব। ছবিটা কর, টাকা-কড়ি হোক।

ছবিটা সত্যিই করবেন তো স্যার। শম্ভু প্রায় হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে এসেছে মিঃ ভোঁসের সামনে, দেখবেন স্যার।

আরে ভাবছ কেন তুমি? তোমায় তো বলেইছি ঐ একটা ব্যবসা, যেটা আমার করা হয়নি, তাই এবার ওতেও নেমে পড়ব।

তবে যে সেদিন অপিসে কাকে যেন ছবি করার কথায় বললেন, নট্ এ পাই অন্ হর্স রেস।

হো হো করে হেসে উঠেছিলেন মিঃ ভোঁস। আরে, ওদের কাছে কখনও ভাঙিনি যে আমি সিনেমা কোম্পানি খুলছি। আর সেই জন্যইতো নিজের নামে না করে তোমার নামে করব হে।

আমার নামে? উত্তেজনায় বুকের স্পন্দন থেমেই যায় বুঝিবা, সত্যি বলছেন স্যার। আমার নামে কোম্পানী?

হ্যাঁ। বললাম না সেদিন, এস, এস, প্রোডাকসান? ওর প্রথম এসটা তোমার, দ্বিতীয় এসটা আমার, কিন্তু লোকে জানবে দুটো এসই তোমার। শম্ভুনাথ সিকদার প্রডাকসান। শেয়ার অবশ্য ফিভটি ফিফটি।

দুচার মুহূর্ত কথা আসেনি মুখে শম্ভুনাথের, তারপরই মিঃ ভোঁসের পায়ের ধূলো নেবার জন্য নীচু হয়েছে। স্যার। আপনি মানুষ নন স্যার, আপনি দেবতা স্যার, আপনি দেবতা। সাক্ষাৎ ভগবান।

আহ-হা। তাই বলে পায়ে হাত দিতে হবে না। মুখ থেকে মোটা চুরুট নামিয়ে মিঃ ভোঁস হেসেছেন। ড্রয়ার খুলে এক গুচ্ছ নোট বার করে শম্ভুনাথের হাতে দিয়েছেন। যাও গার্ল ফ্রেণ্ডকে নিয়ে খাওয়া দাওয়া কর গিয়ে। ঠিক সময়ে গাড়ী যাবে তোমার কাছে, তবে হ্যাঁ, ঐ যে রোগা লোকটা, মেয়েটির বাবা না কে যেন ও, ও যেন আবার সঙ্গে না চলে আসে।

না স্যার। কেউ আসবে না। সে আমি ঠিক ম্যানেজ করবো।

হুঁ। ভাল। মিঃ ভোঁস টেবিলে রাখা ফাইল হাতে তুলে নিতেই ইঙ্গিত বুঝেছে শম্ভুনাথ, আর দাঁড়ায় নি, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এসেছে ঠাণ্ডা ঘর ছেড়ে একেবারে নীচের বাথরুমে। চেপে দরজা বন্ধ করে মুখ দিয়ে হা হা করে নিঃশ্বাস নিয়েছে কিছুক্ষণ, তারপর ধীরে ধীরে সদ্য পাওয়া নোটের গুচ্ছ বের করে গুণতে সুরু করেছে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, একি! একশো টাকার নোটও যে রয়েছে, একেবারে দু' দুখানা। জয় গুরু। কার মুখ দেখে সকাল হয়েছিল আজ, জয় মা কালী। এ যে গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। দেবতা দেবতা, সত্যিই দেবতা লোকটা। শম্ভু মিথ্যে খোসামোদ করেনি ওকে দেবতা বলে। এ তো নররূপে নারায়ণ। স্বয়ং ভগবানের মতই শম্ভুর সব দুঃখ কষ্ট ঘুচিয়ে দিতে শম্ভুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে মিঃ ভোঁসের।

এর থেকে সামান্য কিছু যোগেন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিলেই কন্‌টাক্ট মিটবে, তবে ঐ বড় তু'পাতা, ও তুশো পুরোই শম্ভু রাখবে, আর বাকিটা দিয়ে মানসীকে কিনে দেবে ওর যা কিছু সখের জিনিষ। মিটিয়ে দেবে ওর আবদার। কদিন ধরেই ঘ্যান ঘ্যান করছে, লিপষ্টিক নেই, পাউডার নেই। আরও কত কি বলছিল যে। মার জামা নেই, খোকার প্যাণ্ট নেই, বাবার জুতো নেই।

নাঃ। অত পারবে না শম্ভুনাথ। চোদ্দ গুষ্ঠির জন্য ভাবতে বয়ে গেছে শম্ভুর। আর এই এক মহাদোষ মানসীর। সারাক্ষণ বড় ঘ্যান ঘ্যান করে, সব সময়ই বাড়ী বাড়ী করে। রেষ্টুরেণ্টে গিয়ে চপে কামড় দিয়েই, আহা। খোকনের জন্য নিয়ে গেলে হোত একটু…… রাখীও তো আসতে চায় এসব জায়গায়…মা তো জানেই না এত রকম খাবারও আছে।

মা নাই জানুক, তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে না নিশ্চয়ই, বলতে ইচ্ছা করে শম্ভুনাথের। মা জানেই না। জানবে কি করে? মা কি তোমার মত নওজোয়ান ছুকড়ি যে মাকে মাথায় করে শম্ভুনাথ ঘুরে বেড়াবে সারা কলকাতা শহরে? আরো মুখ খিস্তি করতে ইচ্ছে করে শম্ভুনাথের। কিন্তু মুখ ফুটে এসব কথা বলা যায় না মানসীকে, তাই চুপ করে শুনে যেতে হয় বেচারা শম্ভুনাথকে, রাগে সর্বশরীর জ্বালা করে শুধু। কি ভাগ্য যে আজ বলেনি, আহা, এমন গাড়ী বাবাই চড়লো না। বাবা, বাবা, বাবা। ড্যাবডেবে চোখ, ভিখিরীর মত লোকটাকে দেখলেও রাগ ধরে আজকাল শম্ভুনাথের, কিন্তু উপায় নেই, তাকেই খোসামোদ করে চলতে হয়।

বিয়ের পর দেব খেদিয়ে। কিন্তু শালা সেখানেই না আবার গড়বড়ি বাধায়। তবে মানসী যদি একটু শক্ত হতে পারে—বলে সব মিয়া বিবি রাজী, তা কেয়া করে কাজী। তবে বিবি যে কি করবেন, তা বিবিই জানেন। মানসী তো এখনও জানেই না শম্ভুনাথের প্ল্যান। আর ওকে এখন জানানোর দরকারও নেই। শুধু আগলে আগলে

বেড়ালেই হোল। সিনেমায় নামাবার মুখে মুখে মোটা টাকাটা হাতে আসবার আগেই বিয়েটা সেরে ফেলতে হবে। নাহলে বাপ ব্যাটাই সব হজম করে বসে থাকবে। ওদের অবশ্য একেবারে বঞ্চিত করতে চায় না শম্ভুনাথ, হাজার হোক শম্ভুনাথের প্রাণে দয়া-মায়া তো একটু বেশীই, প্রথমে তো যোগেন্দ্রনাথের অবস্থা দেখেই···নিজের পকেট থেকেই তো তখন মানসীর বাবাকে টাকা দিয়েছে শম্ভুনাথ, মানসীকে তখন তো শম্ভুনাথ দেখেইনি। আজও একেবারে ফাঁকি ওদের দেবে না শম্ভুনাথ, তবে হ্যাঁ, এক বাড়ীতে থাকা-টাকা চলবে না। প্রথমটায় মানসী হয়ত একটু চেঁচামিচি, কান্নাকাটিও করতে পারে, কিন্তু বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠিক মানিয়ে নেবে মানসীকে, তখন মানসীর স্বামী! এখনও তো বুঝিয়ে সুঝিয়ে আগলে আগলে নিয়েই বেড়াচ্ছে। এত জায়গায় নিয়ে ঘুরছে, কিন্তু কোন শালাকে আজ অবধি আঙ্গুলের ডগা দিয়ে ছুঁতে দেয়নি মানসীকে। না আর ভুল নয়। অনেক ঠকেছে শম্ভু। সব কটা মেয়েই ফাঁকি দিয়েছে শম্ভুনাথকে। না দিয়েছে টাকা, না করেছে বিয়ে। একলা ঘরে তক্তপোশে শুয়ে আজও শম্ভুনাথ কড়ি-কাঠ গুণছে, কিন্তু আর নয়। এবার নয়। আর মানসীর মত মেয়েই বা আগে আর কটা দেখেছে শম্ভুনাথ। সত্যি ভাল মেয়েটা। এমন মেয়েকে ভালবেসে সুখ আছে। একে বিশ্বাস করে, বৌ করে ঘরে নিয়ে যাওয়া যায়। তবে সিনেমা করবে, অথচ পরপুরুষের মুখদর্শন করবে না, এমন সোনার পাথর বাটি তো আর হয়না। একটু আধটু ঘোরাঘুরি, হুইস্কি, ব্র্যানডি, একটু এখান সেখান, ডিরেকটার প্রোডিউসারের সঙ্গে একটু ঢলাঢলি, ফষ্টি-নষ্টি এসব করতে তো দিতেই হবে। সে ভালই বোঝে শম্ভুনাথ। এত বোকা সে নয়। ফিল্ম ষ্টার বৌ হবে, বড় বাড়ী, বড় গাড়ি হবে তার দৌলতে, আর ঘোমটায় মুখ ঢেকে বসে থাকবে কেবল শম্ভুনাথের পাশে, তাতো হয় না। যে বিয়ের যে মন্তর। তবে, শম্ভুনাথ অবশ্য সব সময় সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে। যেমন এখনও চলছে মানসীর পাশে বসেই।

মৃদু শব্দ করে গাড়ীটা থামল। শম্ভুনাথ মুখ বাড়িয়ে দেখল। ব্যস। এসে গেছি।

এ কোথায় এলাম শম্ভুদা।

একেবারে সায়েব পাড়া।

সাহেব পাড়ায় কেন শম্ভুদা। একটু যেন উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর মানসার। সায়েবিআনা যদিও খুব ভালো লাগে মানসীর কিন্তু ইংরিজিটা গড়-গড়িয়ে বলতে পারেনা বলে একটু ভয় ভয় করে মানসী সাহেবি লোকদের। ভালো লাগে কিন্তু শিখতে পারেনা। বাবা, শম্ভুদা কেউই পারেনা অবশ্য, তবু শম্ভুদা সাহস করে এগিয়ে যায় দুমদাম ইংরিজি বলে, আর ক্লাস টেন অবধি পড়া ইংরিজি মানে মানসী বুঝতে পারে, কি ভুল বকছে শম্ভুনাথ, হাসি পায় যদিও কিন্তু মনে মনে স্বীকার না করে পারে না যে এ সাহস মানসীর নেই।

এস এস। শম্ভুনাথ দরজা খুলে মানসীকে নামাল হাত ধরে। আলোকিত বাঁধানো পথ ধরে এগিয়ে গেল সামনে।

ও বাবা। লিফটে করে আবার যেতে হবে নাকি।

নাহলে কি সিঁড়ি বেয়ে উঠবে সাত তলায় ?

সাত-তলায়।

হ্যাঁ। একদম সাততলার সবটা নিয়ে মিঃ ভোঁসের ফ্ল্যাট। সেখানে আর কোনও ফ্ল্যাট নেই।

অনেক ভাড়া ! না ?

ভাড়া কি ? এ বাড়িটাইতো মিঃ ভোঁসের।

মিঃ ভোঁসের বাড়ি। মানসীর যেন বিশ্বাস হতে চায়না। এই বিরাট বাড়ি মিঃ ভোঁসের ? বল কি শম্ভুদা ?

তবে। শম্ভু গলার কাছে সার্টের কলার ধরে একবার টানল। চল।

মানসীর বুক টিপটিপ করছিল।

এই কয়েক মাসে শম্ভুদার সঙ্গে অনেক জায়গাতেই গেছে ও। অনেক বড় অফিস, ক্লাব ঘর, রেষ্টুরেণ্ট, কিন্তু এমন নিঃশব্দ, আলোয় উজ্জ্বল বিস্তীর্ণ ঘর, এমন মখমলের মত ভারী পর্দা, এমন জনহীন জায়গায় জনসেবার এত আশ্চর্য্য উপকরণ, আগে কখনও দেখেনি মানসী।

আর শম্ভুদার সঙ্গে এখানে বসে আছে, অন্ততঃ দশ মিনিট, কিন্তু এতক্ষণের মধ্যে একটি প্রাণীরও দেখা পাওয়া গেলনা এত বড় ঘরে। মিঃ ভোঁস কি তার বাড়ীর কেউই কি থাকেনা নাকি এখানে? অথচ অদৃশ্য কোন জায়গা থেকে ভেসে আসছে মৃত্যু সুরের বিলিতি বাজনা। ঘরে কেউ নেই, কেউ শুনছেনা, দেখছেনা তবু কেন রেকর্ড বাজিয়ে আর নানা কায়দায় আলো জ্বেলে খামাখা ইলেকট্রিকের বিল বাড়াচ্ছে দেখ।

মানসীর ইচ্ছে করল উঠে গিয়ে সুইচ টিপে ত্বু'চারটে আলো নিভিয়ে দেয়। কিন্তু সুইচ কোথায় তাও তো দেখা যাচ্ছে না। রং করা দেওয়ালে শুধু দুটো ছবি। যেমন ছবি দেখলে মানসীর হাসি পায়। কিন্তু ঘরের কোণে নীচু টেবিলের ওপর যে ফুল সাজানো রয়েছে, সেই সাজানোর ধরণ দেখে মুগ্ধ হল মানসী।

আহা। যেন সত্যি গাছ সুদ্ধ ফুল ফুটে আছে ঘরের মধ্যে। বাড়ি যখন হবে মানসীর, সে বাড়ির গৃহিণী হবে ও, সে বাড়ী হয়ত এমন বড়, এমন সাজান হবেনা, কিন্তু এমনি সুন্দর করে ফুল সাজিয়ে রাখবে ঘরের কোণে কোণে। ওঠার সময় সিঁড়ির মুখে আর একটা জিনিষ দেখে ভারী ভালো লেগেছিল মানসীর, একটু অবাকও লেগে ছিল। শম্ভুদা বলেছে মিঃ ভোঁস ভারী সাহেবি লোক। কিন্তু ঝন-ঝক করে মাজা পিতলের কলসীতে রজনী গন্ধার গুচ্ছ কেন এমন সাহেব বাড়াতে? এমন কলসী মানসীদেরও আছে। বাবাকে লুকিয়ে যে দু একটা জিনিষ আনতে পেরেছিল মা, পিতলের এই ভারী কলসিটাই তার মধ্যে সবচেয়ে ভারী, আর মার সব চেয়ে প্রিয়। আর

সেই প্রিয় 'কলসের' যে ঠাঁই মিলবে এমন সাহেব বাড়ীতে কে ভাবতে পেরেছিল? পিতলের কলসিতে খাবার জলের বদলে ফুল। হি হি হি। মানসী হাসি চাপতে পারছিল না।

একি? একি? শম্ভু ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে এল।—হঠাৎ আপন মনে হাসতে শুরু করলে কেন? পাগল হয়ে গেলে নাকি? দেখছ সব সাহেবি ব্যাপার এখানে, কেউ জোরে কথাটি পর্য্যন্ত বলে না।

তাই বুঝি। তা তোমাদের সায়েবটি গেলেন কোথায়? মানসী হাত বাড়িয়ে ঈষৎ ঠ্যালা দিল শম্ভুদাকে। ও শম্ভুদা! কই তোমার সায়েব মানুষ মিঃ···মানসীর মুখের কথা শেষ হতে পেলনা, শম্ভুর শঙ্কিত চোখের ইংগিত পাশ ফিরেই দেখল তাঁকে, মিঃ ভোঁসকে। নিঃশব্দ পায়ে কখন যে উনি একেবারে মানসীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, মানসী বুঝতেই পারে নি। জিভ কেটে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল মানসী।

বসুন, বসুন। মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে ঈষৎ হাসলেন মিঃ ভোঁস। মানসীর পাশে এসে বসলেন। মানসী আরো একটু সরে গিয়ে ভাল করে দেখলো পাশে বসা মানুষটার দিকে! এই মিঃ ভোঁস? কই সায়েব? যাঃ। ধবধবে পাজামার ওপর সাদা সুতোর কাজ করা পাঞ্জাবী, আর পায়ে লাল শুঁড় তোলা চটি। গায়ের রংটাও প্রায় শম্ভুদারই মতো, তবে খুব চকচকে, প্রায় ঝকঝকে চামড়া। এ আবার সায়েব কোথায়! সুশোভন এর চেয়ে অনেক বেশী সাহেব। অর্দ্ধেক সময় তো তার কথাই বুঝতোনা মানসী; এত এত বেশী ইংরিজি বলত হুড়মুড় করে। মিঃ ভোঁস তো পুরো বাংলায় গল্প করে চলেছেন শম্ভুদার সংগে। যাঃ। মিথ্যেই ভয় পাইয়ে দিয়েছিল শম্ভুদা।

আপনি কি কি ছবিতে কাজ করেছেন এর আগে?

ছবিতে? একটু অবাক হোল মানসী, দু'এক মুহূর্ত্ত সময় নিল

ভাবতে। ও, ছবি মানে সিনেমা। শুনেছে বটে কথাটা মানসী, পিকচার কনট্রাক্ট। ছবি, অর্থাৎ সিনেমা?

আমি তো ছবিতে কাজ করিনি এখনও, থিয়েটার করেছি তিনটে।

কথা হয়ে আছে স্যার, ঠিকঠাক হয়ে আছে সব। ব্যগ্র, ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শম্ভুনাথের। বললাম না স্যার আপনাকে; অনেকেই চাইছে ওকে নামাতে, কিন্তু আমি বলেছি না, যেখানে-সেখানে যার-তার কোম্পানীতে কাজ করে নাম খারাপ করার দরকার নেই। ভাল গল্প, ভাল ডিরেক্টর, ভাল কোম্পানী, এতে দু'চার টাকা কম হয়, তাও…

না, না। কম কেন হবে? মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে হাসলেন মিঃ ভোঁস। আর কম্পানি তো তোমারই হে শম্ভুনাথ।

আপনার দয়া স্যার।

আরে, ওসব কি বলছো? আমরা সবাই বন্ধু এখানে। ওসব স্যার স্যার বোলোনা! ওসব শুধু অফিসে। এখানে আমরা সবাই এক। কি বলেন মানসী দেবী?

মানসী ঠোঁটের কোণে একটু হাসির ভঙ্গী করল। মিঃ ভোঁস সিগারেট নামিয়ে হাত ঘড়িতে চোখ রাখলেন, কিন্তু ঘটক এখনও আসছে না কেন? যেন আপনার মনেই কথাটা বললেন উনি, মানসীর মনে হোল।

কিন্তু শম্ভুনাথ শুনে নিয়েছে কথাটা, ঝুঁকে পড়ে উৎসুক চোখে চাইল মিঃ ভোঁসের দিকে। কোন ঘটক স্যার। ঐ যে সোনাদিঘির পারে ছবিটা করেছিল।

না, না। অল্প হাসলেন মিঃ ভোঁস। এ তোমাদের সিনেমা জগতের লোক নয়। এ একজন খুব বড় গভর্ণমেণ্ট অফিসার।

ওঃ। সেই যে কণ্ট্রোলার অফ…

হ্যাঁ, সেই মিঃ ঘটক।

*   *   *   *

চল, চল। বাড়িটা দেখিয়ে আনি তোমায়। মিঃ ঘটক দাঁড়িয়ে উঠে মানসীকে হাত ধরে তুললো। শম্ভুনাথ উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী দেখতে যাবার জন্য, কিন্তু টেবিলের তলায় পায়ের ওপর শক্ত পায়ের চাপ পড়তে থেমে গেল। পা তুলে নিয়ে হাত ধরে টেনে বসালেন মিঃ ভোঁস শম্ভুনাথকে। আরে সবাই মিলে গেলে চলে? ওরা দেখে আসুক, আমরা ততক্ষণে আর একটু জমিয়ে হাসি। কি বল? মিঃ ভোঁস গ্লাসে আবার হুইস্কি ঢাললেন। ঠুন করে ঠেকালেন শম্ভুনাথের গ্লাসে, চিয়ার্স।

মিনিট দশেক পরে নতুন পেগ ঢালতে ঢালতে শম্ভুনাথ জিজ্ঞাসা করল, এখনও এলনা ওরা? কোথায় গেল?

মিঃ ভোঁসের নিরুত্তর মুখের দিকে তাকিয়ে শম্ভুনাথ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো। কোন হোটেল-ফোটেলের ঘরে মানিকে নিয়ে গেল নাকি? লিফটের শব্দ পেলাম যেন।

মিঃ ভোঁস স্মিত হেসে মাথা নাড়লেন, আমার বেয়ারা চলে গেল।

বেয়ারা গেল?…তা, ও, ওরা?

মিঃ ভোঁস আঙ্গুল হেলিয়ে পাশের দিকে দেখালেন, আমার শোবার ঘরে।

শোবার ঘরে। তীরের মত আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শম্ভুনাথ, মিঃ ভোঁস! আপনি বলেছিলেন শুধু একটু গল্প সল্প।

আহা। উত্তেজিত হচ্ছ কেন? মিঃ ভোঁস আবার হাত ধরে বসিয়ে দিলেন শম্ভুনাথকে। গল্প-স্বল্পই তো? মিঃ ঘটককে তো দেখলেই। আধ বুড়ো লোক একটা। একটু নিরিবিলিতে দুটো প্রাণের কথা বলতে চায় আর কি।

ওর জন্যই তাহলে মানিকে আনিয়েছেন আপনি আজ ?

বেচারা থাকে দিল্লীতে, কলকাতায় এসে একা একা সময় কাটেনা।

আপনি…আপনি—শম্ভুর বুকের মধ্যে অনেক কান্না যেন ঠেলাঠেলি করে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আপনি নিজে গভর্ণমেণ্টের বড় কণ্ট্রাক্ট পাবার জন্য মাণিকে…মাণিকে আপনি…চোখের নোনা জলে শম্ভুর কথা আটকে গেল।

মিঃ ভোঁস বন্ধুর মত, বড় ভাই-এর মত আস্তে আস্তে কাঁধ চাপড়ালেন শম্ভুনাথের। বললেন, আরে একি হে শম্ভুনাথ, তোমার চোখে জল ?

শম্ভু সার্টের হাতে চোখ মুছছিল, না, তা' নয়, তবে…তা'নয় বলছিল যদিও, কিন্তু নিরুপায় ক্ষোভ আর অক্ষম ক্রোধে ওর বুকের মধ্যে কেমন যে করছিল, যার অভিজ্ঞতা শম্ভুর জীবনে এই প্রথম।

মিঃ ভোঁস এবারও ওকে সান্ত্বনা দিলেন, আরে, একলা ঘরে একটু গল্প করছে বইতো নয়।

অনেকক্ষণ তো হোল, গল্প তবে সবাই মিলেই করা যাক। শম্ভু উঠে দাঁড়াল আবার, মিঃ ভোঁসও উঠে দাঁড়ালেন সঙ্গে সঙ্গে। খুব শান্ত কঠিন চাপা গলায় বললেন, অত বাড়াবাড়ি করছ কেন শম্ভুনাথ ? এমন কাজ এই কি তোমার প্রথম নাকি ?

না, প্রথম নয়, মোটেই প্রথম নয়, এই কাজ বহুদিন বহুবারই করেছে সে, এই তো তার প্রধান জীবিকা, কিন্তু এবার, এবার এ অনুভূতি, এই দুঃখ, যন্ত্রণা, অপমান, পাপবোধ, সর্বোপরি বঞ্চনার জ্বালা, মানসীকে রক্ষা করার ব্যাকুল বাসনা জীবনে এই প্রথম। শম্ভুনাথ জলভরা চোখ তুলে মিঃ ভোঁসের দিকে চাইল, বলতে গেল, কিন্তু এ যে মানসী, এ যে…

শম্ভুকে কথা বলার অবসর দিলেন না মিঃ ভোঁস, আবার তেমনি শান্ত কঠিন কণ্ঠে বললেন, ছটফট কোর না শম্ভুনাথ। যাকে এনেছ, সেও তো আর গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসী পাতা নয়। কাঁধে হাতের

চাপ দিয়ে বসিয়ে দিলেন মিঃ ভোঁস শম্ভুনাথকে, পকেটে হাত দিয়ে বার করলেন নোটের গুচ্ছ, এক দুই তিন, বেশ কয়েকখানা বড় নোট শম্ভুর হাতে দিলেন মিঃ ভোঁস।

নাও ধর। এর সবটাই তোমার।

সবটাই আমার। দম দেওয়া পুতুলের মত শেখানো পাখীর মত শম্ভুনাথ শুধু বলল, সবটাই আমার; আর এই প্রথম, জীবনে এই প্রথম এতগুলো একশ টাকার নোট হাতে নিয়েও কোনও আজকের উত্তেজনায় শিহরিত হোল না শম্ভুনাথ, হাতের মধ্যে খড়খড়ে কাগজগুলো পকেটে ঢোকাতেও ভুলে গেল। শুনতে পেল মিঃ ভোঁস আবার বলছেন, টাকাগুলো রাখ ঠিক করে, এর সবটাই তোমার। মানসীর টাকা আলাদা, ওকে তোমায় কিছু দিতে হবে না, আমরাই দেব।

টাকাগুলো মুঠি করে ধীরে ধীরে শম্ভুনাথ বসে পড়লো মাটিতে। মিঃ ভোঁস হাই তুললেন। উঃ। ঘুম পেয়েছে বড়। যাই শুয়ে পড়ি।

শম্ভু চশমার কাঁচের মধ্য দিয়ে মিঃ ভোঁসের মুখটা দেখছিল: লাল লাল চোখে কি অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে যে মানুষটাকে।

তুমিও ওইখানে, এই ডিভানটার ওপরই শুয়ে পড়, এই কুশান দুটো নাও বালিশ হবে। বিশ্রাম করে নাও, একটু পরে ড্রাইভার তোমাদের পৌঁছে আসবে। গুড নাইট। লাল চটিতে মৃদু শব্দ তুলে মিঃ ভোঁস চলে গেলেন। আর পকেটে টাকা আর গালে নোনা জল নিয়ে শম্ভুনাথ সেই মেজের ওপরই বসে রইল চুপ করে।

———

চাবী ঘোরানর শব্দে ফিরে দেখল মানসী মিঃ ঘটক বন্ধ দরজার এধার থেকে চাবী ঘুরিয়ে দিলেন, ঝুলতে লাগল চাবীটা ঝকঝকে দরজার ওপরেই। চাবী দিলেন কেন, প্রশ্নটা ঠোঁটে এনেও উচ্চারণ করতে পারল না মানসী। কে জানে এসব বাড়ির এই নিয়ম বোধহয়। এসব দরজা দিয়ে ঢুকতেও তো ভয় হয়।

এই নাকি মিঃ ভোঁসের শোবার ঘর, বললেন মিঃ ঘটক। ঘরটা যদিও খুব সুন্দর আর সাজানো, কিন্তু বসবার ঘর দেখার পর এ ঘরটা আর এমন কি দেখাবার? মানসী আস্তে এসে খাটের পাশে বড় চেয়ারটায় বসল, আর মিঃ ঘটক একেবারে হৈ হৈ করে উঠলেন, আহা-হা, ওখানে কেন, ওখানে কেন, তুমি বসবে এখানে, এসো এসো।

দু'হাত বাড়িয়ে মানসীকে উনি একেবারে বুকের কাছে টেনে আনলেন, বসিয়ে দিলেন নিজের কোলে, তোমার জায়গা এইখানে সোণামণি। মানসী ঠিক বুঝতে পারছেনা, ভদ্রলোক কি ওকে একে-বারেই বাচ্চা মেয়ে ভেবেছেন নাকি···

মানসী ক্ষীণ স্বরে না, না বলে চেষ্টা করল মিঃ ঘটকের কোল থেকে উঠতে কিন্তু উনি ততক্ষণে বেশ জোরের সঙ্গেই আঁকড়ে ধরেছেন, মানসীকে বুকের কাছে, কোলের ওপর। তারপর বিছানার পাশে টেবিলে রাখা গ্লাসটা তুলে ধরলেন ওর মুখের কাছে, নাও চুমুক দাও একটা, দেখবে ভালো লাগবে, খুব ভালো লাগবে।

মানসীর অবাক অবাক লাগছে, ঠিক বুঝতে পারছেনা, কোন ধরণের ব্যবহার এটা। একটু আগেই খাবার ঘরেও জোর করে ওর মুখে মিঃ ঘটক মাংসের টুকরো পুরে দিয়েছিলেন পরম যত্নে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন ছোট খোলা ছাতের সাজান বাগান। একটা বড় ফুল তুলে ওর চুলে গুঁজে দিলেন। বাঃ। যেন শকুন্তলা। মানসীর

লজ্জা করলেও তখন খুশী খুশীই লাগছিল, কি যত্ন, কি সমাদরই করছেন এতবড় লোকটা তাকে। কিন্তু এখন হঠাৎ কেমন ভয় করে উঠল মানসীর, যেমন ভয় ওর হঠাৎ হঠাৎ করে রেষ্টুরেণ্টের বন্ধ ঘরে বসে। না, তায় চেয়েও ভয়, আরো বেশী ভয়। জোর করেই প্রায় গ্লাসের সেই ফাঁক ফাঁক ঈষৎ পীতাভ পাণীয়টা সবটাই খাইয়ে দিলেন তাকে মিঃ ঘটক। আর একি? গালে গলায় হাত বোলাতে বোলাতে কোথায় নেমে আসছে ওঁর হাত? কি কি? ঘোলাটে ভাবে বুঝতে পারছে মানসী, বুঝতে পারছে কি চেষ্টা করছেন মিঃ ঘটক। না, না অসহায় হাতে ঠেলা দিতে চেষ্টা করলো মানসী, উঠতে চাইলো কোল থেকে, কিন্তু ততক্ষণে ওকে বিছানায় ফেলে দিয়েছেন মিঃ ঘটক, বুকের কুঁড়িতে হাত ঘষে ঘষে প্রায় ছিঁড়ে ফেলেছেন জামাটা। না, না. আবার প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করলো মানসী, আর তার নরম ঠোঁটে হিংস্র দাঁত বসে গেছে তখন, শাড়ীও গায়ে নেই। দুঃশাসন। দুঃশাসন। বিড়বিড় করে বললো মানসী তার চোখে কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া, ঘরের নীলচে আলোয় সব যেন স্বপ্ন, ও যেন কোন জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে, আর কোনদিন উঠতে পারবেনা ওপরে, হাওয়া, কোথায় সেই বুক জোড়া খোলা হাওয়া, বড় গাছে ঘেরা উঁচু পাহাড়ের হাওয়া কই? এযে ময়লা কালো জলের তলায় থিকথিকে কাদার মধ্যে পুঁতে যাচ্ছে মানসী, মাথা তোলার চেষ্টা করছে দু'একবার, চেষ্টা করছে ঘিনঘিনে পাঁকের ময়লা জলের ওপরে ওঠার, বন্ধ ঘরের বাইরে খোলা বাগানে ছুটে পালাবার, তাজা হাওয়ার নিঃশ্বাস নেবার, কিন্তু কই? কেন উঠতে পারছেনা, ধোঁয়া ধোঁয়া, সব অন্ধকার হয়ে আসছে চোখের সামনে।

———

ঘরের বাইরে কথাবার্তার চাপা আওয়াজ, মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর আর বন্ধ জানলার ফাঁকে তীর্যক একটি আলোর রেখা, ঘুম ভেঙ্গে গেল মানসীর।

বাবার কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছেনা শুধু একবারই শুনল, উঠে যাব আপনার হুকুমমতো, ক্যান। এখানে আমিও যা, আপনিও তাই। ভাড়া আপনেও দেননা, আমিও দিই না, আপনি আমায় উঠে যাও বলার কে ?

এখানে থাকতে হলে ভদ্রভাবে ভালভাবে থাকতে হবে বুঝলে ? পাঁচজন গেরস্তর বাস এখানে। সেই গেরস্তর বাড়ী বসে বেলেল্লাপনা করার মজা দেখাব। বুঝবে তখন, ভাড়া দিই আর না দিই, আমি কি করতে পারি বুঝলে ? নিশীথবাবুর গমগমে গলার প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট শুনতে পেল মানসী।

কি ! মজা দেখাবেন ? গোঙানির মত বাবার চীৎকার, আর তারপরই মার ত্রস্ত আর্ত্ত কণ্ঠস্বর। চুপ। চুপ। চুপ করেন গো। পায়ে ধরি, আপনাকো পায়ে ধরি।

খনখনে আওয়াজে আবার কি বললেন নিশীথ বাবুর স্ত্রী, বাবা, নিশীথ বাবুও চাপা স্বরে কি যেন বললেন, তারপর গলাগুলো এত নীচু হয়ে এল যে সম্মিলিত কণ্ঠস্বরের আওয়াজ কানে এসে লাগলেও তাদের কথা আর বোঝা গেল না। পরম ক্লান্তিতে মানসী আবার চোখ বুজল।

একটু পরেই দরজা ঠেলার শব্দ হোল, বাবা ঢুকল ঘরে, মাও এল।

মানসী তাড়াতাড়ি চাদর টেনে দিল মাথা পর্য্যন্ত, চোখ বুজে পাশ ফিরে শুল।

মা ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করল চেপে, হিসহিসে কঠিন গলায় বলল, ওরে আজ খুন করুম আমি।

নাটক কোরনা। বাবার বিরক্ত, তিক্ত স্বর ভারী মিষ্টি লাগল মানসীর কানে। নাটক কোর না। ঠিক বলেছে বাবা। সব সময়ই সব কিছুতেই মা এত নাটক করে।

এখন ধীরে ধীরে ছায়া ছায়া সব মনে পড়ছে মানসীর। দরজা খুলে মানসীকে দেখেই বিকট আর্ত্তনাদ মার। আর তারপর মার। চড়, ঘুষি, কিল, লাথি।

ওপাশের ঘর থেকে ছুটে এসে বাবা যদি না তার ভাঙা হাত দিয়ে মানসীকে বাঁচাত, তাহলে মায়ের হাতে মার খেয়েই বোধহয় মরে যেত মানসী। বাবাও তাই বলেছিল মাকে, পাগল হলে নাকি, মইর‍্যা যাবে যে মেয়েটা।

আজ মনে পড়ে হাসি পেল মানসীর। শরীরের মার? কত আর মারবে মা? তার আগেই তো মরে গেছে মানসীর এই শরীরটা, ডুবে গেছে পাঁকের তলায়, যেখান থেকে মানসীর শরীরটা কিছুতেই তো উঠিয়ে আনতে পারেনি মানসী, তাই তাকে মরতেই দিয়েছে।

মরার আগেও শেষ চেষ্টা করেছে মানসী, ডেকেছে সেই সকল দুঃখহারী রক্ষাকর্তা শ্রীমধুসূদনকে। তুমি দ্রৌপদীর লজ্জা রক্ষা করেছিলে প্রভু, বাঁচাও, এই দুঃশাসনের হাত থেকে আমায় বাঁচাও। কিন্তু নারায়ণ হরি সাড়া দেননি তার ডাকে। সেই বন্ধ সাজান ঘরে সেই নরম গদির ওপর তাকে মরতে দিয়েছেন।

মানসী অবশ্য ফেরার পথে গাড়ীর দরজা খুলে ঝাঁপ দিতে চেষ্টা করেছিল, চেষ্টা করেছিল মৃত্যুটাকে সম্পূর্ণ করতে, শম্ভুদা আটকেছে। বলেছে কেন মরবে মণি। একটা জোচ্চরের পাল্লায় পড়ে ঠকে গেছি আমরা, তাই বলে মরতে হবে? না একদিন শোধ নিতে হবে, ওদের ঠকাতে হবে, আমাদের বাঁচতে হবে, টাকা করতে হবে।

তুমি কিছু জানতে না?

না মণি, না। দুচোখ জলে ভরে এসেছে শম্ভুর, মণি তোমাকে আমি ভালবাসি, তোমাকে আমি—তোমাকে আমি···

ভালবাস? ভালবাস? মানসীর পাগলের মত হা-হা হাসিতে থমকে থেমে গেছে শম্ভুনাথ, বাকী রাস্তা আর একটা কথাও বলেনি, শুধু বাড়ীর কাছে এসে গাড়ীর দরজা খুলে হাত ধরে মানসীকে নামিয়ে দিয়েছে। ফেরার সময় আর সেই বিরাট রাজহংসের মত গাড়ী নয়, ছোট পুরোণ গাড়ী একটা, যে গাড়ী অনায়াসে মানসীদের গলিতে ঢুকতে পারে। মানসীকে নামিয়ে দিয়েই চকিতে অদৃশ্য হয়েছিল শম্ভুনাথ, অন্যদিনের মত ভেতরে আর আসেনি।

খুকী। উঠলি নাকি? বাবার নীচু আওয়াজ, চোখ একটু খুলে মানসী দেখল মা এগিয়ে আসছে একটা কিছু বলার জন্য, কিন্তু বাবা হাত নেড়ে বারণ করল মাকে আসতে। বলল, মানসীর জন্য এক পেয়ালা গরম চা করে আনতে।

হ্যাঁ। গরম এক পেয়ালা চায়ের এখন বড়ই প্রয়োজন মানসীর।

বাবা আস্তে মানসীর মাথায় হাত রাখল, কি রে? কেমন আছিস এখন?

ভালই। মানসীর ইচ্ছা করল জিজ্ঞাসা করে, কেন? কি হয়েছে আমার? কিন্তু কথা বলতে ক্লান্ত লাগছে মানসীর, আর সারা গায়ে কি ব্যথা। একটুক্ষণ চুপচাপ দুজনেই। মানসী জানলা দিয়ে ঝক-ঝকে রোদে ঝলমল আকাশ দেখল, একটা পরিষ্কার হাওয়াকে যেন ও প্রায় স্পর্শ করতে পারবে, বুকের মধ্যে খালি খালি লাগলেও কেমন একটা আশ্চর্য্য অন্যরকম লাগছে নিজেকে, বাবাকে, এই ঘর বাড়ি সব কিছু।

যোগীন্দ্রনাথই আবার কথা বলল, শম্ভুটারে আর কোনদিন বাড়ীতে ঢুকতে দিমু না আমি। কিছু ভাবিস না তুই।

চকিত হোল মানসী, কেন? কি করেছে শম্ভুদা? কি দোষ তার?

করে নাই? অবাক হবার পালা এবার যোগীন্দ্রনাথের। আমি তো ভাবলাম এই বুঝি…তাহলে এমন চেহারা ক্যান তোর? জামা-কাপড় ছিঁড়া…তুই টলতে টলতে মদের গন্ধও তো পাইছিলাম তোর মুখে…

হঠাৎ ভীষণ, ভীষণ কান্না পেল মানসীর।

মানসী বলে দেবে, সব বলে দেবে বাবাকে। তার দুঃখ, তার অপমান, তার মৃত্যুর সবিস্তার কাহিনী মানসী জানিয়ে দেবে তার বাবাকে, দেখিয়ে দেবে মিঃ ভোঁসের বাড়ী। কাল রাত্রে মিষ্টি হেসে মিঃ ভোঁস মানসীকে গুডনাইট করেছিলেন, বলেছিলেন, বৃষ্টি পড়ছে এখনও একটু সাবধানে রাস্তা পেরোবেন, তারপর আবার বলেছিলেন, উঃ বড় ঘুম পেয়েছে, যাই শুতে যাই, বলে সহসাই খড়মড়ে কতকগুলো নোট মানসীর গলার কাছে, ব্লাউজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে শাড়ীর আঁচলটা টেনে দিয়েছিলেন ভাল করে, তারপর নিশ্চিন্তে ঘুমোতে চলে গিয়েছিলেন নিজের সেই সাজান সুন্দর ঘরে নরম বিছানাতে।

কিন্তু আজ? মানসী তার বাঙাল বাবাকে বলে মুহূর্তেই ভেঙে দিতে পারে মিঃ ভোঁসের সেই নিশ্চিন্ত আরাম, গলার শান্ত স্বর। কে বাঁচাবে তাকে যোগীন্দ্রনাথের হাত থেকে? রক্ষা করবে কে?

কিরে! শীত করছে? কেঁপে উঠলি মনে হয়। জ্বর হয়নিতো? যোগীন্দ্রনাথ মানসীর কপালে হাত রাখল, কই, গা তো ঠাণ্ডা।

না, জ্বর হবে কেন? ধীর শান্ত স্বরে মানসী বলল। তবে?

কি তবে?

কাল তা হইলে হইলটা কি? যোগেন্দ্রনাথ ছেড়ে যাওয়া প্রসঙ্গে ফেরার চেষ্টা করল আবার। কোথায় ছিলি কাল অত রাত পর্য্যন্ত, শম্ভুর সাথে?

মানসী চুপ। শান্ত কঠিন মুখে পাশ ফিরে শুয়েই থাকল।

যোগীন্দ্রনাথের এবার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল বোধহয়, বাঁ হাত দিয়ে মেয়ের কাঁধে জোরে একটা ঝাঁকুনি দিল ও, অত রাত অবধি তাহলে তোরা কাল ছিলি কোথায় ?

মানসী জামার মধ্যে হাত দিয়ে নোটের গোছা বার করল; বাবার হাতে দিয়ে বলল, বড় বকাও তোমরা। কোথায় অবার যাব। রিহ'সাল ছিল কাল ।

রিহ'সাল। নোটগুলো হাতে নিয়ে কেমন বিহ্বল, বোধ করল যোগেন্দ্রনাথ। রিহ'সাল ছিল কাল অত রাত অবধি মানসীর। কি যেন। যোগীন্দ্রনাথের হিসাবটা সব গোলমাল হয়ে গেল। মনে মনে ও এতক্ষণ কত চোখা চোখা কথা শানিয়ে রেখেছে শম্ভুনাথকে বলবে বলে, কারণ যোগেন্দ্রনাথ ভেবেছে কালকের সব টাকা শম্ভুনাথই মেরেছে নিশ্চয়ই, তাছাড়াও মেয়েটাকে কি করেছে কে জানে ? কিন্তু একি ? টাকা খুকীর হাতে ? আর এত টাকা ? মেয়েটা যোগীন্দ্রর সত্যিই সেয়ানা হয়ে উঠেছে দেখা যায়।

মেয়ের সামনে নতুন বড় বড় নোটগুলো গুণতেও ভরসা হচ্ছিল না যোগীন্দ্রর। দুই, তিন, না চার ? কতগুলো নোট আছে এর মধ্যে হাজার টাকাই আছে নাকি, কে জানে ? তাহলে তো ফিলমের কনট্রাক্টই হয়েছে মনে হয়। কিন্তু কনট্রাকটের কাগজ কই তবে ? কি বই ? কার প্রডাকসান ? এসব কথাই জিজ্ঞাসা করতে চাইল যোগীন্দ্রনাথ, কিন্তু মানসীর বোজা চোখ আর শান্ত ঠাণ্ডা মুখ দেখে আর কথা বাড়াবার ইচ্ছা হোলনা যোগেন্দ্রনাথের, মেয়েকে একটু হঠাৎ ভয় পেল যেন যোগেন্দ্রনাথ, হাত ভরে টাকা এনেছে আজ··· পাশের ঘরে গিয়ে নিরিবিলিতে বরং নোটগুলো গোণা যাক।

মানসী বিছানার ওপর বসে পায়ের নখে যত্ন করে রং লাগাচ্ছিল, যোগেন্দ্রনাথ হাতে বাজারের থলি নিয়ে এসে দাঁড়াল। মানসী চোখ তুলে একবার বাবার দিকে দেখল। পরক্ষণেই আবার মাথা নীচু করে রং লাগানোয় মন দিল।

যোগেন্দ্রনাথ একবার, তুবার কাশল, একটু অপেক্ষা করল, তারপর বলল, কিরে খুকী। দে।

ঘাড় না তুলেই মানসীয় ভ্রু কুঞ্চিত হোল। কি আবার দেব।

বাঃ, যোগেন্দ্রনাথের গলায় কাঁজ ফুটল এবার। কি আবার দিবি মানে? বাজার যেতে হবেনা? বেলা হয়ে যাচ্ছেনা।

বেলা হয়ে যাচ্ছে তো যাও, আমি কি করব?

শুধু হাতে বাজার হবে নাকি? টাকা লাগবেনা?

তাতো লাগবেই।

তবে। সেইক্ষণ থেকে দাঁড়ায়ে আছি তো টাকারই জন্য। তোমার কাছেইতো টাকা আছে। পরশুই তোমায় দিলাম আমি পঞ্চাশ টাকা সে সবই খরচ হয়ে গেল?

সে তো দিছিস আমার চশমার লাইগ্যা···

পঞ্চাশ টাকা তোমার চশমার লেগে গেল? বল কি বাবা। না না যোগেন্দ্রনাথ একটু লজ্জিত যেন। পঞ্চাশ টাকা আমার চশমায় লাগে নাই, লাগছে পঁচিশ টাকা।

তবে?

আরো বিব্রত বোধ করল যোগেন্দ্রনাথ, আরো সব খরচ আছে না? তোর মায়ের পেট ব্যথার সেই ওষুধটা আনলম, আর খোকনের একটা প্যাণ্ট। যেটা পরে স্কুলে যায়, একদম ছিঁড়া।

ছিঁড়া। একদম ছিঁড়া। জ্বলে উঠল মানসী, চীৎকার করে

বলল আবার ছিঁড়া। টাকা হাতে পেলেই তোমাদের যত সব ছিঁড়া, ফুটো, ওষুধ, ডাক্তারের ফর্দ্দ।

কি করি বল? যোগেন্দ্রনাথ রাগ করলনা, মেয়ের পিঠে হাত রেখে স্নিগ্ধ কোমল গলায় বলল, কি করি বল খুকী? সবইতো চাই মা। জীবন ধারণ করতে হলে প্রয়োজন তো সবটারই। আর খোকারে তুই-ই তো করপোরেশনের স্কুল ছাড়াইয়া বড় স্কুলে দিছিস। বড় লোকের ছেলেরা সব পড়তে আসে সেখানে, ছিঁড়া, ফুটা পইর‍্যা সেখানে যায় কি করে, বল?

মানসী চুপ করে শুনল, চুপ করেই থাকল আরো একটুক্ষণ, বাবার এই দীন প্রার্থনার ভঙ্গিটা যেন উপভোগ করল মনে মনে, তারপর সুন্দর পুঁতির কাজ করা হাত ব্যাগ খুলে টাকা বের করে দিল বাবার হাতে।

মোটে দুই টাকা। বিস্মিত নয়, বিষণ্ন, ক্লান্ত কণ্ঠস্বর যোগীন্দ্রনাথের। দুই টাকায় কখনও বাজার হয় আজকাল কার দিনে।

মানসী চিৎকার করে বলতে চাইল, তবে কি দুশ টাকা চাই নাকি, কিন্তু হঠাৎ বাবার চোখে চোখ পড়ে থমকে থেমে গেল মানসী। কি অদ্ভুত ভয় পাওয়া দৃষ্টি ঘোলাটে চোখে, কেন? কেন এত ভয় পেল বাবা। বাবা কি তাহলে ঠিকই বুঝেছে যে মানসী এখুনি চিৎকার করে উঠবে টাকা, টাকা, টাকা। খালি দাও, দাও, দাও। পারবোনা আর পারবোনা দিতে আমি।

মা ছুটে এসে কপাল চাপড়িয়ে কান্না সুরু করবে মেয়ের রোজগারে খেতে হচ্ছে বলে নিজের মৃত্যু কামনা করবে, মৃত্যু কামনা করবে স্বামীর এবং দুই ছোট ছেলে মেয়ের। সব জড়িয়ে একটা রীতিমত গা ঘিনঘিন করা নাটক।

আর বাবা তখন মাকেই বকে, আঃ কি করছ? যাও যাও এখান থেকে পিঠে হাত বোলায়, বলে তোর মায়ের কথা কানে নিসনা খুকি,

ওর মাথাটা একদম গেছে গিয়া। আর এইজন্যই শুধু এইজন্যই বাবাকে এক এক সময় ভারী ভালো লাগে মানসীর ভালবাসতে ইচ্ছা করে।

মাথা নীচু করে মানসী আবার ব্যাগ খুলল, একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে বাবার হাতে দিল। ত্ব'টাকার লাল নোট ফেরৎ দিতে হাত বাড়াল যোগীন্দ্র, মানসী মাথা নাড়ল, রাখ ওটা তোমার কাছেই, খোকন বলছিল কমলালেবু খাবে, নিয়ে এস ত্ব'টাকার।

যোগেন্দ্রনাথ মাথা হেলিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। মানসী কাগজ নেড়ে হাওয়া দিয়ে নখের রং শুকিয়ে উঠে দাঁড়াল।

আজ রবিবার সকালেই রিহার্সাল। নটার মধ্যেই বোসদার অফিসে পৌঁছতে হবে। গাড়ী আসবে না, আর সেই জন্যই ট্যাকসি ভাড়া বোসদা আগেই দিয়ে রেখেছেন।

কিন্তু আজ একটু আগে বেরিয়ে বাসে করেই যেতে হবে, ট্যাকসি ভাড়ার টাকাটাই সে দিয়েদিল বাবাকে। আগের ত্ব'টাকা ফেরৎ নিলেই হোত, হাতে কিছু থাকতো।

থাকগে। ট্যাকসি ভাড়া দিয়েছে বলেই সে ট্যাকসি করেই যেতে হবে তার কি মানে আছে? সময় মত পৌঁছলেই হোল। সময় মত! হ্যাঁ, সব কিছুই বোধহয় সময় মত হলেই আর কোন ঝামেলা থাকেনা। ঠিক সময়ে ঠিক ট্রেনটিতে যদি চড়ে বসতে পারো, তাহলেই তো শম্ভুদার ভাষায়, কেল্লা ফতে।

ঠিক ট্রেনটা ধরতে পারবিকি এখনও। জ্যোৎস্নাদি বলেছিলেন। ভুল ট্রেনে চড়ে ভুল ষ্টেশনে নেমে খালি ঘুরে মরছিস গোলক ধাঁধায়। তাই কি? কিন্তু ভুল ট্রেনে তো মানসী নিজে ওঠেনি, ওকে উঠিয়ে দিয়েছে কে? বাবা! শম্ভুদা? ঠিক যেন ওদেরও দায়ী করতে পারে না মানসী, ওরা তো ওর ভালই চেয়েছে, আর বেচারা শম্ভুদা মিঃ ভোঁসের বাড়ীর সেই রাতের পর যখন দেখা হোল দিন সাতেক পরে, সেই সেদিন মানসীর সত্যি একটু জ্বর হয়েছিল, ও চুপচাপ

শুয়েছিল তক্তপোশে, আর খোকন ওর পাশে বসে স্কুলের পড়া তৈরী করছিল। কেমন নিঃশব্দে এসে পাশে বসে শম্ভুদা হঠাৎ হু হু করে কেঁদে উঠেছিল। মানসীই তখন সান্ত্বনা দিয়েছিল শম্ভুনাথকে। —কেঁদনা শম্ভুদা কেঁদনা। যা হবার হয়ে গেছে, আমি মন থেকে মুছে ফেলেছি, আর মনইতো সব।

ঠিক তাই, ঠিক তাই। শম্ভুনাথ হাতের উল্টো দিকে চোখ মুছে ভারী নরম করে তাকিয়েছে মানসীর দিকে। ভুলে যেতে পারবে মানি তুমি ও রাতটা একেবারে ভুলে যেতে পারবে।

পারবো কি? এখনই তো ভুলে গেছি আমি, যেন ওটা জানিইনি।

আঃ! বাঁচালে, বাঁচালে আমায় তুমি মানি, আমিও তোমায়, তোমায় সেই কথাই বলতে বোঝাতে চাইছিলাম, আর দেখ, এবার থেকে পার্টির সঙ্গে কথা বলতে, দেখা করতে তোমাকে আর কোনদিনও নিয়ে যাব না। একেবারে কণ্ট্রাক্ট সই করে, টাকা নিয়ে তারপর যাবে তুমি।

টাকা নিয়ে। হঠাৎ খুব হাসি পেয়েছিল মানসীর। টাকা নিয়ে! টাকা। হ্যাঁ সে রাতটা মানি ভুলে যাবে বটে, কিন্তু অতগুলো টাকা তো আর ভোলা যায় না। শম্ভুদাও যে সেদিন মোটা টাকাই নিয়েছে হাত পেতে, তা মানসী ভালোভাবেই বোঝে।

আর আজ আফশোষ হয় মানসীর, সে রাতের সব টাকাটাই বাবার হাতে তুলে দেবার জন্য। আজকাল সে সাবধান হয়েছে, আজকাল নিজেই সই করে। হাত পেতে টাকাও নিজেই নেয়। না বাবা, না শম্ভুদা। মাঝের সাঁকোটা ভেঙ্গে দিয়েছে মানসী, নিজেই এখন পারাপার করতে পারে। ডুববে কি ভাসবে সব এখন মানসীর নিজের হাতে। রিহার্সালেও বাবাকে আর নিয়ে যায়না মানসী, বলে সব সময় তোমার আমার সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া ভাল দেখায়না বাবা। তোমার একটা সম্মান আছে তো?

যোগীন্দ্রনাথ কি বোঝে কে জানে, ঘোলাটে চোখে চুপ করে তাকিয়ে দেখে মেয়েকে সঙ্গে যাবার কথা নিজে থেকে আর বলেনা।

কখনও কখনও চিনেবাড়ির চিলি চিকেন কি ফ্রায়েড রাইস নিয়ে আসে মানসী কাগজের বাক্স করে, যোগীন্দ্রনাথের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

খুকী। আজ গিয়েছিলি বুঝি রেষ্টুরান্টে? সাথে কে ছিল? কে খাওয়াইল? শম্ভুনাথ ছিল নাকি সাথে?

বাবার অনেক প্রশ্নের একটাই সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় মানসী, না খাইনি কোথাও। বাড়ীর জন্য কিনে আনলাম, সবাই খেতে পারবে

হ্যাঁ। সেতো ঠিকই। খোকন, ছোট খুকী, তোর মায়, সবাই খেতে পারবে, মাথা নেড়ে সায় দেয় যোগেন্দ্রনাথ, কিন্তু বাবার চোখে ক্ষোভের ছায়া দেখতে পায় মানসী।

তার খুব খুকী খুকী লাগে তখন মানসীর। ভারী একটা মজা পায় ও। খুব জব্দ হচ্ছে বাবা। গাড়ী করে বেড়ান, রেষ্টুরেন্টে বসা, পাঁচ দশ টাকা হাত পেতে নেওয়া সব বন্ধ এখন। কেন যে বাবার ওপর থেকে থেকেই এখন একটা রাগ ধরে মানসীর। আর বাবার হতাশ মুখটা, ছাই ছাই হয়ে আসা লোভে জ্বলজ্বল চোখের চাওয়া, হঠাৎ ঝুলে পড়া গালের পেশী দেখতে ভারী মজা লাগে। কেমন একটা জয়ের গন্ধ যেন অনুভব করে ও। আবার পরক্ষণেই কি ক্লান্ত, বিষন্ন লাগে মানসীর। এই সব খেলা, বাবাকে জব্দ করা কি শম্ভুদাকে ফাঁকি দিতে পারার মজায় আর একটুও মন লাগে না, সব ফেলে, সব কিছু ছেড়ে ছুটে পালাতে চায় ও যেমন আগে চাইত।

যদিও আগের মত এত ঘন ঘন এত অস্থির আর লাগেনা মানসীর, কারণ মন খারাপ করেই ছুটে পালাতে চাইলেও জ্যোৎস্নাদির বাড়ী গিয়ে হাজির হয় ও।

এক বছর আগে যে মদ ওকে ঠকিয়ে ভুলিয়ে খাইয়ে দিয়েছিল মিঃ ভোঁস আর মিঃ ঘটক, সেই মদ এখন পরম তৃপ্তি ভরে ধীরে ধীরে

পান করে মানসী। পান করে আনন্দ পায়, সব জ্বালা, যন্ত্রণা জুড়িয়ে যায়, কিছুক্ষণের জন্য অন্ততঃ সব কষ্ট ভুলে থাকা যায়, চলে যাওয়া যায় অন্য একটা জগতে। আর তাই প্রতি সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নাদির বাড়ী যেতেই হয় মানসীকে।

যদিও এ্যালবার্ট, এ্যালবার্ট রয় বলে যে ছেলেটার সঙ্গে বেশ একটু ভাব হয়েছে মানসীর বাবা আর শম্ভুদার অজানতে, সে বারণ করে। বারবার বলে, মানসী, কেন তুমি ঐ জ্যোৎস্না বোসের বাড়ী যাও বলোতো ?

কেন কি হয় গেলে।

যেওনা, যেওনা ওখানে, ভালো নয় ওরা, ভাল লোক নয়।

ভাগ ! জ্যোৎস্নাদি এত ভাল, কত ভালবাসেন আমাকে।

তা হয়ত বাসেন, কিন্তু রোজ সন্ধ্যায় ওখানে যাও কেন তুমি ? কি হয় ? কি পাও।

কি যে হয় জ্যোৎস্নাদির বাড়ী, কি পায় ও সেখানে, সে কথাটা তো আর এলবার্টকে খুলে বলা যায়না।

এলবার্টকে মানসীর বেশ ভালই লাগে, আর বেশ বুঝতে পারে মানসী যে এই ক্রীচান ছেলেটির তার প্রতি ভাল লাগাটা একটু একটু করে কোথায় এগিয়ে চলেছে, আর মানসীরও বুকের মধ্যে মাঝে মাঝেই কেমন ছলছল করে ওঠে, মনে হয় এই বুঝি সেই, যার হাত ধরে ও চলে যেতে পারে দূরে, অনেক দূরে।

কিন্তু সেই মানসী তো আর নেই, মিঃ ভোঁসের বাড়ীর সেই নরম বিছানার ওপর সে যে মরে গেছে এক বছর আগেই, এখন এই মানসীকে অন্য অনেক কিছু করতে হবে, অনেক কাজ।

খুকী। তুই এখনও যাস নাই ? মা ফিরল যেন কোথা থেকে যেন রাখীর হাত ধরে।

কেন ? কটা বাজল ? এ'মা। নটা বেজে গেল নাকি ?

না, না। নটা বাজে নাই এখনও, ভোঁ শুনি নাই তো।

আচ্ছা। চলি মা, আজ হয়ত একটু দেরী হবে, আমার খাবার টাকা দিয়ে রেখ ?

বিছানার ওপর থেকে ব্যাগ তুলে উঁচু হীলের আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল মানসী।

আর মেয়ের চলে যাওয়ার দিকে অনেক, অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল মেয়ের মা শৈলবালা।

এই মানসী। এই শৈলবালার প্রথম সন্তান মনি, মনিমালা থেকে যার নাম হোল মানসী।

এর হাওয়ার মত ফুরফুরে শাড়ী, খটখটে জুতোর আওয়াজ, এর গায়ের হালকা সুবাস, সব মিলিয়ে এই মেয়েকে বড় দূর, বড় অন্য মেয়ের মত মনে হয় শৈলবালার।

নিজের মেয়ের চোখের চাউনিটাও তার অজানা। ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ও অনেক সময় মনে হয়েছে শৈলবালার, এ কে ? এই রাজকন্যার মত রূপ, এই পোষাক পরিচ্ছদ, এর চুলের কায়দা, গায়ের গন্ধ কোনও কিছুই শৈলবালার চেনা নয়। এই মানসী ওর মনি নয়, নয় বড় আদরের প্রথম সন্তান মনিমালা, এ যেন কোন ভিন্ দেশের মেয়ে বেড়াতে এসেছে শৈলবালার কাছে, ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে, জেগে উঠেই চলে যাবে কোথায় কোন অজানা দেশে। কোথায় যায় ও, কি করে সঠিক জানা নেই শৈলবালার, শুধু মেয়ে আর তার বাপ মনে হয় দিন দিন সরে যাচ্ছে ওর কাছ থেকে, হারিয়ে যাচ্ছে এই শহর কলকাতায়। শৈলবালার ক্ষমতা নেই ওরে রক্ষা করে, আগলে রাখে। শৈলবালার হাতের বাইরে গিয়েছে যে মেয়ে, গিয়েছে ওর ধরা ছোঁয়ার অনেক দূরে, কে তাকে রক্ষা করবে ? হে ঠাকুর। হে নারায়ণ। তুমি ছাড়া তাকে রক্ষা করবার আর কেউ নেই।

এত দেরী? হাত থেকে গ্লাস নাবিয়ে জ্যোৎস্নাদি উঠে দাঁড়ালেন। আমি ভাবলাম তুই বুঝি আর আজ এলিই না।

বাঃ। আসব না মানে? ছোট সুগন্ধি রুমালে কম্পিত ঘাম মুছে বসল মানসী। তোমাকে কথা দিয়ে গিয়েছি না?

কিন্তু মহাশয়ার আসার কথা ছিল কটায়, তা বলো।

কি করি বল? গিয়ে জানতে পারলাম, শুক্রবার রিহার্সাল হবে না বলে অর্ধেক বইটাই দু'বার রিহার্সাল হোল, তাছাড়া···মানসী থেমে গেল।

তাছাড়া'টা কি? জ্যোৎস্নাদি গ্লাসে একটা ছোট চুমুক দিলেন, বোসদার সঙ্গে বেড়িয়ে এলি একটু? চোখ তেরছা করে ঘাড় ঘুরিয়ে সুন্দর একটা ভঙ্গী করলেন জ্যোৎস্নাদি, চলে গেলি একেবারে বোসদার ঘরে? প্রেম না পয়সা কি পেলি বল?

আঃ জ্যোৎস্নাদি। দিনরাত তোমার বোসদাকে নিকে ঐসব বাজে রসিকতা। বোসদা সে ধরণের লোকই নন।

রাম, রাম। সব রকম লোককেই আমার জানা আছে। এখন বল, বেলা পাঁচটা বাজল কি শুধু শুধু?

নাঃ। অন্য ঝামেলায় পড়েছিলাম।

অন্য ঝামেলা? সে আবার কি?

আর বল কেন। উদার কণ্ঠস্বর মানসীর, বুঝিবা কিছুটা বিষণ্নতা। তোমায় তো সবই বলেছি। গত বছরের সেই ঘটনার পর থেকে শম্ভুদার মাথায় কি যে গেছে, ও তো লাইন নাকি একদম ছেড়েই দিয়েছে।

ইঃ। জ্যোৎস্নাদি ঠক্ করে ওর কাঠের টেবিলে কাঁচের গ্লাস রাখলেন। লাইন ছেড়ে দিয়েছে। অত সোজা কিনা। ও ছাড়তে

চাইলেই যেন ওর পার্টিরা ওকে ছাড়তে দেবে। আমার যেন আর জানতে কিছু বাকী আছে ?

না, না, ব্যাপার আছে, তুমি জাননা। নিজের গ্লাসটা হাতে তুলে এক চুমুক পান করলো মানসী।

আঃ। কি আরাম। কি স্বস্তি। তারপর বললো, ব্যাপার আছে, তোমায় বলা হয়নি।

কি এত ব্যাপার। জ্যোৎস্নাদিও বেশ একটু অবাক চোখে তাকালেন। আমাকে বলা হয়নি, কি ?

সেই সেদিনের ব্যাপারটা মোটামুটি পাড়ার সকলেই তো জানতে পেরে গিয়েছিল ।

ভাগ। পাড়ার লোকে কি করে জানবে তুই সন্ধ্যে রাতেই সব খুইয়ে চলে এলি।

আঃ আঃ। জ্যোৎস্নাদি। মানসীর গলায় আওয়াজ, কত যে কান্না, জ্যোৎস্নাদি একটু অপ্রতিভ হলেন, তাড়াতাড়ি কাছে এসে মানসীর পিঠে হাত রাখলেন। সরি, সরি মানসী। তোকে কিছু বলতে হবে না, অন্য কথা বল।

জ্যোৎস্নাদির হাতটা পিঠের ওপর থেকে সরিয়ে দিল মানসী। খুব শান্ত স্বরে বলল, না, না, ও কিছু নয়, শোন। যে করেই হয়, কদিন যে রিহার্সালে নয়, আমি যে অন্য কিছু করে এসেছিলাম, পাড়ার সকলেই সেটা জানতে পেরেছিল, বুঝেছিল যেন কেমন করে। তোমায় তো বলেছি কদিন পর ঝণ্টুদা আর কয়েকটা ছেলে মিলে আমার পেছন পেছন শিষ দিতে দিতে আর খারাপ গান করতে করতে এসেছিল, আর ঝণ্টুদা বলেছিল, মাইরী। আমাদের পাড়ার মেয়ে, আর মহব্বৎ করবে অন্য লোক, শালা জেনে আয়না কত করে রেট ?

হ্যাঁ। তারপর তোর কান্নাকাটি দেখে তোর পাড়ার মস্তানরাই

এখন তোকে রক্ষা করে সব সময়। সেদিন তো হাতজোড় করে ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছিল।

হ্যাঁ। তা নিয়েছিল, আর ঝণ্টুদাতো এখন খুবই বন্ধুর মতই। সত্যই আমায় হেল্প করে, লাইব্রেরী থেকে বই এনে দেয়।

তবে ?

না, মানে, আমাকে ওরা কিছু আর না বললেও শম্ভুদাকে ওরা ধরেছিল রাস্তার মোড়ে তেকোণা পার্কটার কাছে। ঝণ্টুদা ছিলনা অবশ্য।

ধরে কি করল ?

মার। আবার কি ? বেদম মেরেছিল। নাক ফাটিয়ে দিয়েছিল মেরে। তারপর সেই রক্ত ঝরা নাক নিয়েই শম্ভুদাকে নাখ খৎ দিতে হয়েছিল সারা পার্কটা।

বলিস কি ?

হ্যাঁ, তাতেও ওদের আশ মেটেনি, তারপর কাঁচি দিয়ে খামচা খামচা চুল কেটে লাথি মেরেছে, বলেছে মেয়ের চামড়ার ব্যবসা তোমার খতম করো এবার।

শম্ভুদা কাঁদতে কাঁদতে কান মুলে বলেছে আর কখনও এরকম করবেনা, তবে ওরা শম্ভুদাকে ছেড়েছে।

ওমা সত্যি !

হ্যাঁ। চিঠি লিখে আমাকে জগুবাজারের কাছে ডেকে নিয়ে একটা চায়ের দোকানে বসে সব বলল শম্ভুদা। সেই থেকেতো আমাদের বাড়ী আর আসেই না। আমি ফোন করি মাঝে মাঝে। তবে ঝণ্টুদা বলেছে আমায়—না, না শম্ভুদাকে আসতে বলবেন, কোন ভয় নেই ওর, ও একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল।

ঝণ্টুদা বুঝি পাড়ার মস্তানদের হেড ?

কে জানে, মানসী রং করা সুন্দর ঠোঁট একটু ওল্টাল।

সে যাক ? এখন আবার শম্ভুর জন্য নতুন কি ঝামেলা বল ?

আবার নিয়ে যেতে চাইছে কোথাও, কারুর বাড়ী? কোন ফ্ল্যাটে? কি চায়টা, কি ও।

বাচ্চা মেয়ের মত, ঝরণার জলের মতো হেসে উঠলো মানসী, এখন আমায় বিয়ে করতে চায়।

করে ফেল। জ্যোৎস্নাদিও হাসলেন। বর বরণ আমি করব বলে রাখছি। আর দুধে আলতায় পা রাখবিতো? তোকে ভাল মানাবে মাইরি। এখনও খাসা কচি কচি বৌ বৌ গন্ধ আছে তোর চেহারায়। শম্ভুদার আর দোষ কি? দেখে দেখে আমারই মাথা ঘুরে যায়।

আঃ জ্যোৎস্নাদি, থামোতো। আজকাল এক পেগ পেটে পড়তে না পড়তেই যা সুরু কর তুমি।

থাম ছুঁড়ি। জ্যোৎস্নাদি গ্লাস খালি করে মানসীর দিকে তাকালেন। পেগের মধু তুই এখনই কি বুঝবি রে? সবে তো কলির সন্ধ্যে।

কি বাজে বকতে আরম্ভ করলেন যে। যাই স্নানটা সেরে আসি।

যা। স্নানের ঘর তোমার জন্যে কখন থেকেই তৈরী। কিন্তু বাথটবে বসে সেদিনের মত দেরী কোরনা যেন। অতিথিদের আসার সময় হয়ে এল। জ্যোৎস্নাদিও আবার লহর তুলে হাসলেন।

কি করি বল জ্যোৎস্নাদি। তোমার বাথরুমে ঢুকলে আমার আর বেরুতেই ইচ্ছে করে করেনা, আর বাথটবে চান করার যা আরাম।

হুঁ। আমার বাথরুমে ঢুকলে তোমার বেরুতে ইচ্ছে করেনা, আর আমার বেডরুমে ঢুকলে।

যাও। খালি তোমার ফাজলেমি। প্রায় ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মানসী। স্নানের ঘরে ঢুকে দু'এক মুহূর্ত দাঁড়াল চুপচাপ। সত্যি, জ্যোৎস্নাদির যাকে বলে 'টেষ্ট' আছে। নাতি বৃহৎ পুরোণ কালের এই বাথরুমটা মাজা ঘষা ঝকঝকে করে এমন সুন্দর সাজিয়ে

রেখেছে যে মনে হয় এই খানেই এই বাথটবের সুগন্ধী জলে গা ভাসিয়ে দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে মানসী। হালকা মিষ্টি গন্ধটা ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে। আর জানলায় লতার গুচ্ছ, বেগুনি রংয়ের কি এক নাম-না জানা লতা দুলছে বন্ধ জানালার ওপর। সব মিলিয়ে পরিবেশটি সত্যিই মনোরম। এমন একটা স্নানের ঘর যদি মানসীরও থাকত।

হবে, হবে। শম্ভুদার মত জ্যোৎস্নাদিও বলে, হবে সব হবে। দুটি বছর শুধু আমাকে সময় দেনা তুই। তোর সাজানো ফ্ল্যাট, গয়না, ব্যাংকে টাকা কত কি করে দিই, তুই একবার দ্যাখ।

জ্যোৎস্নাদি আরও বলেন, তুই থাকনা এখানে এসে। ছেড়ে দে তোর সেই অমনি পাওয়া বাড়ী। তোর বাড়ীর লোকেরা থাক সেখানে, তুই আমার সঙ্গে এখানেই থাক। বরাবরই বলেন জ্যোৎস্নাদি।

মানসীর লোভ হয়, খুব ইচ্ছে হয় জ্যোস্নাদির কথামত এইখানেই থেকে যেতে। কিন্তু ও যদি এইখানেই থেকে যায়, তাদের সেই অমনি পাওয়া বাড়ীতে আর ফিরে না যায়, সেই বাড়ির লোকগুলোর হবে কি? কি খাবে তারা? কি করবে? কেমন করে খোকনের স্কুলের মাইনে দেবে? বাবার চোখের ওষুধ চশমা, হাঁপানি আর মার পেট ব্যথার ওষুধ—রাখীর জামা জুতো বই খাতা—খোকনের স্কুল—

জ্যোৎস্নাদি বলেছেন, তুই এখানে থাকবি বলে কি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দিবি? যাবি মাঝে মাঝে। টাকা দিবি ফের চলে আসবি এখানে।

সহজ সমাধান। কিন্তু এত সহজে এ সমাধান হয় না মানসী জানে। জ্যোৎস্নাদি হয়ত ঠিক পরামর্শই দেন, তবু কোথায় যেন বাধে। বাবা মা, ভাই-বোন, মানসীর নিজের বাড়ী, নিজেদের সংসার, সবাইকে ফেলে একা একা না তা হয় না। হতে পারে না।

প্রায় এক বছর ধরে, জ্যোৎস্নাদির সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকেই

প্রায়ই এই অনুরোধ করে আসছেন জ্যোৎস্নাদি, আর জ্যোৎস্নাদির সব কথাই যদিও মানসী মানে, জ্যোৎস্নাদিকে খুব, খুবই বেশী রকম পছন্দ করে, আর এই মনোরম পরিবেশ, জ্যোৎস্নাদির অনুক্ষণ সঙ্গ সবই যদিও পরম লোভনীয় মানসীর পক্ষে, তবুও পারবেনা, মানসী পারবেনা বাড়ী ছেড়ে নিজের বাবা-মা ভাই বোন ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারবেনা।

আগে যে অনুক্ষণ মনে হোত চলে যাব, চলে যাব, এইসব ছেড়ে কোন অজানা অথিতির হাতে হাত রেখে চলে যাব—সেই ডাক, সেই ব্যাকুল আহ্বান কখন যেন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এসেছে। কবে? জানে মানসী। সেই যে রাতে মিঃ ভেঁাসের বাড়ীতে সেই নরম বিছানায় কাদা আর পাঁকের মধ্যে মৃত্যু হয়েছিল তার, তারপর থেকেই সেই সুরই যখন থেমে গেছে, মানসী ভুলতে চেয়েছে সেই ডাক, চোখ থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছে সেই স্বপ্ন।

আর সেই স্বপ্নকে একেবারে ধুয়ে ফেলতে চায় বলেই মানসী এখানে আসে, মদ খায়, তাস খেলে টাকা নেয়।

জানে, মানসী জানে যে তারই জন্য, তার যুবতী মুখের জন্যই জ্যোৎস্নাদির তাসের আড্ডায় ভিড় হয়, মদের পাত্র শূন্য হয় ঘন ঘন, কাগজের নোট হাওয়ায় ওড়ে। আরোও জানে মানসী। জানে জ্যোৎস্নাদির ভালবাসাও মূলতঃ এই কারণেই। মানসীর জন্যই অভ্যাগতের ভীড় বাড়ে, অর্থাগম হয়। জ্যোৎস্নাদির কাছে মানসীর সেই-জন্যই এত দাম, এমন খাতির। আর এটা জেনে ভালই লাগে মানসীর। সে যে নিতান্তই খালি হাতে কিছু নিচ্ছেনা, হাত উপুড় করে কিছু দিতেও পারছে এই বোধ মানসীর মনে বেশ একটা আত্ম-তৃপ্তির ভাব এনে দেয়। প্রয়োজনমত জ্যোৎস্নাদির কাছে টাকা নিতে তাই তার বাধে না। বাধে না জ্যোৎস্নাদির পয়সায় নিত্য মদ খেতে, গাড়ী করে এখান ওখান ঘুরতে। আর সবচেয়ে ভাল লাগে এখানে মানসী সম্পুর্ণ স্বাধীন বলে।. নিজের ইচ্ছাতেই ও এখানে

বসে মদের গ্লাসে চুমুক দেয়, জুয়ায় জেতে বা হারে, বা কিছুই ও করুক এখানে ও নিজের মালিক নিজেই, মাঝ পথে শম্ভু বা বাবা কেউ নেই, আর তাই এত ভাল লাগে মানসীর এখানে আসতে. জ্যোৎস্নাদির বাড়ী তাই ওকে এত টানে।

এক এক সময় অস্পষ্ট ভাবে যেন বুঝতে পারে মানসী, যে এই ভালো লাগাও, এই সুন্দর স্বাধীনতাও মানসীর জীবনে আর বেশীদিন নেই। জ্যোৎস্নাদির এই সুন্দর সাজান আলোকিত ঘরের মাঝেই কোথায় যেন অন্ধকার লুকিয়ে আছে নীচু হয়ে, সুযোগ পেলেই লাফিয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়বে মানসীর ওপর, আবার. আবার ডুবে যাবে মানসী সেই অতল অন্ধকারে। চমকে উঠল মানসী। ওকে? ওকে হাত বাড়াচ্ছে মানসীর দিকে, এগিয়ে আসছে।

ওঃ। মানসীর নিজের হাতের ছায়া। তোয়ালে রাখছে হ্যাঙ্গারের ওপর। ওঃ। এত ভয় হয়েছিল, মুহূর্তের জন্য যেন সেই ঘিনঘিন করা পাঁকে আবার ডুবিয়ে নিচ্ছিল মানসীকে। ঈশ্বর। এই ভয় থেকে কবে মুক্তি দেবে তুমি মানসীকে, কবে করবে সম্পূর্ণ স্বাধীন, অন্য সব মেয়েদের সঙ্গে এক হবে, সমান হবে মানসী ?

গাছের নীচে জলের দিকে চেয়ে চুপচাপ বসেছিল যোগীন্দ্রনাথ। দূরে কোথাও ঢং ঢং করে অনেকগুলো ঘণ্টা বেজে গেল, যোগেন্দ্রনাথ চমকে উঠে হাতের পোড়া বিড়িটা জলে ফেলে দিল। ইস। ছাই হয়ে গেছে একেবারে। হবে না? কতক্ষণ থেকে এইখানে এই জলের ধারে বসে বসে শুধু ভাবছে আর ভাবছে। ভাবছে তো কতই, কিন্তু এত ভেবেও কোনও উপায় বার করতে পারছে কই?

হা ভগবান। এ তুমি কি করলে! এই ভয়ই যোগেন্দ্রনাথের বরাবর ছিল, শেষে তাই সত্যি হোল ভগবান? মানি বিয়ে করবে? বিয়ে করে বাপ মা ভাই বোন সকলকে ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাবে নিজের সংসার করতে?

মানি এখনও নিজের মুখে এসব কথা বলে নি অবশ্য তার বাবাকে,

মাকেও বলেনি কোন কথা, কিন্তু জানে, যোগেন্দ্রনাথ জানে। রাত করে ফেরাটা তো কিছুদিন আগেই বন্ধ করেছিল, কিন্তু সন্ধ্যা রাতেই যে ও রোজই মদ খেয়ে বাড়ী ফিরত, সে কি বোঝেনি যোগেন্দ্রনাথ? আবার এই গত কয়েকদিন মদের আড্ডায় যে মানি মোটেই যায়না সে সংবাদও অজানা নয় যোগেন্দ্রনাথের। কিন্তু কেন? ব্যাপারটা কি? সেইতো বোঝা যাচ্ছে না। শম্ভুর সংবাদ, মানি বিয়ে করবে। মানি নাকি নিজের মুখেই ওকে বলেছে ও বিয়ে করছে, চলে যাবে, এই বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে। চলে যাবে? ইস। এত সোজা? যাব বললেই যাওয়া যায়। এতগুলো লোককে ভাসিয়ে দিয়ে চলে অমনি গেলেই হোল?

কিন্তু সত্যি যদি যায় তো কি করতে পারে যোগেন্দ্রনাথ. গায়ের জোরে আটকাতে তো আর পারে না কুড়ি বছরের মেয়েকে। উঃ। এই ভয়টাই যোগেন্দ্রনাথের বরাবর ছিল। কত সামলে, কতদিকে চোখ খোলা রেখে চলেছে এতদিন যোগেন্দ্রনাথ, কিন্তু তবু শেষ রক্ষা হোল কই? দোষ অবশ্যই যোগেন্দ্রনাথের নয়, নিজের কাজে ও ঢিলে দেয়নি কখনোও, চোখ সব সময় খোলাই রেখেছে কিন্তু কি যে হোল সেই শম্ভুর সাথে একা বেরুনোর পর থেকে। কানে ফুসমন্তর কি শম্ভুটাই দিল নাকি? কিন্তু শম্ভুর কথামতই যে মেয়ে আজকাল চলে, তাও তো মনে হয়না। শম্ভু আজকাল আসেও কম। আসলে বসে গল্প-সল্প করে, কথা-বার্তা কয় ঠিকই কিন্তু মানসী বেরোয় তো একা একাই।

সাজ গোজ করে মোড়ের কাছে গিয়ে ট্যাকসি ধরে, হুস করে বেরিয়ে যায়। বরং নিশীথবাবুর ছোট পোলাটার সঙ্গে হাসাহাসি, ফুসফাস করতে দেখা যায় মানিকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। ঐ ছোড়াটাই জপাল নাকি শেষে? পর করে দিল মেয়েটাকে? ক্যাইটা ফেলুম। একেরে দুইখান কইর‍্যা ক্যাইটা ফেলুম। মুঠি শক্ত হোল

যোগেন্দ্রনাথের। লেকের কালো জলের দিকে চেয়ে জল ভরে এল ওর চোখে।

বেইমান। নিমকহারাম মেয়ে। নিজের সুখটাই এত বড় হোল তোর? বুড়ো অথর্ব বাপ কি মার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু কচি ভাইটার কথা তো একবার ভাবতে হয়। কি হবে তার? ভাইস্যা যাবে যে।

বিলাত থেকে ছেলেকে ব্যারিষ্টার করে আনার স্বপ্ন তো যোগেন্দ্রনাথ কবেই ছেড়েছে, ছেড়েছে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেটের বাপ হওয়ার আশা, কিন্তু ভাল স্কুল, ভাল কলেজে পড়ে মোটা মাইনের চাকরী যাতে করতে পারে. সে ব্যবস্থাটা অন্ততঃ করতে হবে তো? নাঃ! রোগা মুঠি দিয়ে কাঠের বেঞ্চে শক্ত ঘুষি মারল যোগেন্দ্রনাথ, আর মেরেই উহু-উহু করে প্রায় চেঁচিয়েই উঠল। কি জ্বালা! একটা শক্ত কাঠের বেঞ্চ, মনের জ্বালায় সে কথা ভুললে চলবে কেন? কষ্ট তো পেতেই হবে। আরে? চোখের জল যোগেন্দ্রনাথের ঈষৎ বাঁকা হাসির সঙ্গে জড়িয়ে গেল। এই সামান্য লাগায় কষ্ট পেলে চলবে কেন? অনেক শক্ত অনেক কঠিন জীবন যে এখন শুরু হোল। লম্বা একটা নিঃশ্বাস পড়ল যোগেন্দ্রনাথের। জিরজিরে বুক কাঁপিয়ে চোখে জল এল আবার। কি করবে যোগেন্দ্রনাথ, কি করবে এখন? এই কয়েক বছরের অনভ্যাসে কাজ করার ক্ষমতাও তো চলে গেছে, আর কাজ করার শক্তিই বা কোথায় পাবে। ডান হাতটা তো ক্রমেই প্রায় কাঁধ পর্যন্ত অসাড় অচল হয়ে গেল। মানি বলেছিল, বিলাত পাঠাবে বাপকে হাতের চিকিৎসার জন্য। হা ভগবান। সবই যোগেন্দ্রর পোড়া অদৃষ্ট। না হলে মেয়েটা ছিল তো ভালই। বাপ-মার প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ছিল, আর ছিল ছোট ভাই বোনদের ওপর ভালবাসা। অবশ্য তাদের ও এখনও ভালই বাসে, আর চেঁচামেচি করলেও টাকা পয়সা যখন যা দরকার, সবই যুগিয়ে যাচ্ছে ঠিকঠাক, কিন্তু তার কয়েকদিন পরে। যখন ও বিয়ে করে চলে যাবে।

নাঃ। শম্ভু যাই বলুক, মানি কখনও এত নিষ্ঠুর হবেনা, যদিই বিয়ে করে ও, স্বামীর সঙ্গে চলেই যায়, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা করে যাবে, বাবা-মা-ভাইবোনের জন্য। মাসে মাসে টাকাও পাঠাবে নিশ্চয়ই। মোটা টাকাই বৈকি, বিয়ে যখন বড়লোককেই করছে।

বড়লোককে বিয়ে করছে। কে বলল। কই! শম্ভু তো বলেনি এ'কথা। মনে হয়, যোগীন্দ্রনাথের তাই মনে হয়। মেয়ে আজকাল সেয়ানা, চতুর হয়েছে, আগের মতো বোকা ভালমানুষ তো আর নয় মানসী। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়েই মেয়ের মন কোন পথে চলেছে আজকাল, বুঝতে পারে যোগেন্দ্রনাথ। আর টাকা পয়সাও তো আজকাল ভালই কামাই করে মনে হয়। নিত্য নতুন কাপড়, সাজের বাহার তো মেয়ের দিন দিন বেড়েই চলেছে। এত সাজগোজ, এত রংচং, এত এত টাকা ব্যাগ ভরা? একি সব সোজা ধর্ম পথে আসছে? হুঃ। সংসারটাকে চিনতে, জানতে যেন যোগীন্দ্রনাথের আরও বাকী আছে।

কিন্তু এখন উপায়টা কি? করবে কি যোগীন্দ্রনাথ? মেয়েকে জিজ্ঞাসা করবে সরাসরি? সেই বোধহয় ভাল। স্পষ্ট কথায় কষ্ট নেই, শম্ভু বলে ঠিকই। মেয়েকে ডেকে আজই এখুনিই স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করবে যোগীন্দ্রনাথ, এত ভয় কিসের? যোগীন্দ্রনাথ সার্টের হাতে চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল, আর চটির মধ্যে পা ঢোকাতে গিয়ে ওর মনে হোল, বিয়ের কথা জেনে নেবার আগেই মেয়েকে জিজ্ঞাসা করবে যোগীন্দ্রনাথ যে নতুন চটি জুতা আনার কথা ছিল মানির তার বাপের জন্য, সেটা আনবে কিনা, কবে? এই চটি পায়ে দিয়ে আর রাস্তায় বার হওয়া যায়? রোজই বলে আনব আনব। আনে কই? তার চেয়ে যদি গোটা পনেরো টাকা ফেলে দেয় বাপের হাতে, অন্ততঃ দশটা টাকাও, চুকে যায় ল্যাটা। যোগীন্দ্রনাথ নিজেই দেখে শুনে কিনে আনে পছন্দ মত একজোড়া চটি। কিন্তু তাতো দেবেনা।

সব নিজে করা চাই···ক্রমশঃ এত হাত টান হচ্ছে মেয়ের। একসাথে দশটা টাকা বাপের হাতে তুলে দিতে বুক ফাটে আজকাল মানির। আবার যুক্তি কেমন, বলে তোমার হাতে টাকা দিলে জুতো তো কিনবে না তুমি, যা তা করে উড়িয়ে দেবে টাকাটা অর্থাৎ সেই টাকা মদ খেয়ে খরচ করবে যোগীন্দ্রনাথ, জুতো কেনা আর হবে না। বেশ করবে, মদ খাবে যোগীন্দ্রনাথ। এক আধ দিন, মাঝে মধ্যে একটু নেশা না করলে চলে ? রোজ রোজ তো আর মাতাল হয়ে বাড়ী ফেরে না তোমার মত। ইঃ। নিজের বেলায় দোষ নেই, যত দোষ করেছে এই বুড়ো বাপটাই। যোগীন্দ্রনাথ জোরে জোরে পা ফেলে বাড়ী এসে পৌঁছাল। কিন্তু মানি কই ? এত তাড়াতাড়ি কোনদিন তো ও বেরিয়ে যায় না। আর এ কদিন, প্রায় দশ বারো দিন বাড়ী থেকে বেরোয়ইনি মনে হয়। ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে খালি গুণগুণ গান, আর আয়না নিয়ে শতবার করে নখ রাঙান, ঠোঁট রাঙান আর টিপ কাটা। আজও মানিকে তেমনি ঘরের মধ্যেই পাবে ভেবেছিল। ভেবেছিল, চা খেতে খেতে আজ গল্প জমাবে মানির সঙ্গে আগের দিনের মতো। এটা, ওটা নানা কথার ফাঁকে হঠাৎই ছুম করে প্রশ্নটা করবে, তুই নাকি বিয়ে করছিস।

সাদা হয়ে যাবে মেয়ের মুখ, শুকনো ঠোঁঠ জিভ দিয়ে চেটে বোজা বোজা গলায় বলবে, কে বলল ?

হুঙ্কার দিয়ে উঠবে যোগীন্দ্রনাথ। বলতে লাগে না কারুর আমি সব জানি। তারপর ? তারপর···কি করবে যোগীন্দ্রনাথ ? আর একটা সম্ভাবনাও আছে, মানি যদি বলে, মিথ্যে কথা। যদি বলে সব বাজে, সব গুজব। ঠিক, ঠিক। তাই বলবে মানি। ধরা পড়ে যাবে শত্তুর চালাকি, বাজে কথা।

কিন্তু মেয়েটা গেল কোথায় ? যোগীন্দ্রনাথ অস্থির, চঞ্চল হয়ে উঠল। উঠোনে পায়চারী করতে করতে হঠাৎ ভয় করল যোগীন্দ্রনাথের

চলে গেল নাকি ? আজই চলে গেল। না, না তা হয়না, তা কখনও হতে পারে না, মানি কখনও এত নিষ্ঠুর এত অবিবেচক হতে পারে না।

শৈলবালা এসে খাবার জন্য ডকাডাকি করল বার দুয়েক, বাঁ হাত ঝাকিয়ে সজোরে তাকে ধমকাল যোগীন্দ্রনাথ। বলছি, আজ একটা সন্ধ্যা মানির সাথেই খামু।

সে মেয়ের আসা যাওনের কিছু ঠিক আছে নাকি ? হয়ত রাত দুইটার সময় আইস্যা বলবে খাব না আজ কিছু, খাইয়া আসছি আমি।

মেলা কতগুলান ফ্যাচ ফ্যাচ কোরনা তো, যাও তুমি যাও। প্রায় চেঁচিয়েই উঠল যোগীন্দ্রনাথ, শৈলবালা দুমদুম পা ফেলে, মর তবে উপোস কইর‍্যা বলে চলে গেল ভেতরে।

যোগীন্দ্রনাথও ধীরে ধীরে এসে মানসীর ঘরে ঢুকল। প্রায় একবছর হোল ওদের এই ছোট গৃহস্থলির মধ্যেই একটা নিজস্ব ঘর করে নিয়েছে মানসী। বাইরের দরজারও গা চাবী করে নিয়েছে একটা, মানি যত রাতেই আসুক, দরজা খুলে দেবার জন্য আর উঠতে হয়না যোগীন্দ্রনাথ কি শৈলবালাকে, নিঃশব্দে চাবী ঘুরিয়ে নিঃশব্দেই নিজের ঘরে ঢুকেই শুয়ে পড়ে মানসী।

আজও বোধহয় অনেক রাত্রেই বাড়ী ফিরল মানসী খটখাট জুতো খুলে বোধহয় হাতে নিয়েছে, নিঃশব্দেই ঘরে ঢুকল, হাতের ব্যাগটা অন্ধকারে বিছানার ওপর ছুড়ে ফেলল, তারপরই উপুড় হয়ে পড়ল বিছানায়।

বিছানার পাশেই নতুন ক্যাম্প চেয়ারে গা ঢেলে বসেছিল যোগেন্দ্রনাথ, অপেক্ষা করতে করতে একটু বুঝি তন্দ্রা এসে গিয়েছিল, কিন্তু মানসীর লঘু পায়ের শব্দেই ঘোর কেটে গিয়েছিল ওর, ভাবছিল মানসী আলো জ্বাললেই ও কথা বলবে।

কিন্তু একি ? বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মেয়ে, ওঠার তো কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না, ঘোর মাতাল নাকি ? নেশার ঝোঁকে একেবারেই বেসামাল। উঠে সুইচ টিপে আলো পর্যন্ত জ্বালাতে

পারছে না? এমন তো কখনও হয় না। যত রাতেই ফিরুক মেয়ে, যে অবস্থায়ই ফিরুক, পোশাক বদলে সাবান দিয়ে মুখ ধোয়। ঝোলান আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে মুখে ক্রীম ঘষে। তারপর শুতে যায়। কিন্তু আজ হোল কি? পোশাক বদলান নেই, মুখে ক্রীম ঘষা নেই। আর খাওয়া? মনে হয় আগের দিনের মত খাওয়াটা আজ বাইরেই সেরে এসেছে মানি।

ধ্যুত্তোরি। নিজেই যোগীন্দ্রনাথ এতক্ষণ মেয়ের জন্য বসে বসে ঝিমোল। খাও এখন কড়কড়ে ঠাণ্ডা ভাত একা একা।

উঠে দাঁড়াল যোগীন্দ্রনাথ, খট করে সুইচ টিপে আলো জ্বালল, আর চিৎকার করে বিছানার উপর উঠে বসল মানসী। কে···কে··· কি···কি···।

ইলেকট্রিকের আলোয় মেয়ের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল যোগীন্দ্রনাথ, বৃষ্টির ধারার মত জল ঝরছে মেয়ের তুচোখ দিয়ে।

এ্যালবার্টের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল সকাল দশটায়, ওর ফ্ল্যাট ওয়েলেসলিতে। কি নাকি ভীষণ দরকারী কথা আছে ওর সঙ্গে। দরকারী কথাটা যে কি তাতো মানসী কিছুটা বুঝেইছে কিন্তু এ্যালবার্টকে ও যে কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। জ্যোৎস্নাদি অবশ্য ওকে বলেছেন, খবর্দার, ঐ শূয়ার ঘটকটার কথা কখনও কারুকে বলবি না, জীবনেও না, সে স্বামী, প্রেমিক, খরিদ্দার যেই হোক। কিন্তু মানসী জানে তা মানসী পারবে না। এতবড় ব্যাপারটা লুকিয়ে রেখে এ্যালবার্টের সঙ্গে আর বেশী ঘনিষ্ট হতে পারবে না মানসী। এ্যালবার্টকে মানসীর ভাল লাগে, সুশোভনের মত অতটাই না হোক, তবু ভাল যে লাগেই, সে সম্বন্ধে সন্দেহর অবকাশও নেই। সুশোভনের মত ফর্সা নয় এ্যালবার্ট, রংটা বেশ কালোর দিকেই, কিন্তু তু'ফুট তু'ইঞ্চি লম্বা, বলিষ্ঠ এ্যালবার্টের হাতে হাত রেখে যখন মানসী রাস্তা হাঁটে, তখন ভারী একটা নিশ্চিন্ততা একটা আশ্বাসের সুখে ভরে থাকে মানসীর বুক। অনুক্ষণ তাকে তাড়া করে ফেরে যে ভয়টা, সেটা

হঠাৎ কোথায় পালায়, আর চিনচিন করা যে কষ্টটা লাফিয়ে উঠে মাঝে মাঝেই ওর গলা চেপে ধরে, যে যন্ত্রণাটাকে নামাবার জন্যই সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নাদির বাড়ী যায় ও, সেই জালে পড়া পাখীর মত ছট-ফটানিরও চিহ্ন থাকেনা কিছুক্ষণ। বেশ লাগে মানসীর, এ্যালবার্টের হাতে হাত রেখে ওয়েলেসলি, ফ্রী স্কুল স্ট্রীট পাড়ার গলিতে গলিতে ঘুরতে, হঠাৎ দাঁড়িয়ে রাস্তার কোন দোকান থেকে কাঠি কাবাব আর কুলপী খেতে। পার্ক স্ট্রীটের নামাজাদা কোনও রেষ্টুরেণ্টে ওকে কখনও নিয়ে যায়নি এ্যালবার্ট, কিন্তু গড়ের মাঠে গঙ্গার ধারে হেঁটে হেঁটে ঘুরেছে ওরা অনেকক্ষণ, আর মানসীর মনে হয়েছে, বাঃ বেশতো। গাড়ী করে না ঘুরেও, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে অতি সাবধানে ছুরি কাঁটা চালিয়ে দামী খাবার না খেয়েও বেশ তো লাগে এই রাস্তার কাবাব আর পরোটা, কুলপী আর আলুর দম। আর এ্যালবার্টের চোখ যত গভীর হয়েছে, গাঢ় হয়েছে গলার স্বর, ততই অন্য একটা ভয়, অন্য এক ভাবনা, থেকে থেকে চকিত, উন্মনা করেছে মানসী। কি হবে? কি হবে? কি করে জানাবে মানসী এ্যালবার্টকে তার সেই মৃত্যুর ইতিহাস। দিন কয়েক আগেই হঠাৎ এমন হয়েছিল পরিস্থিতি, মনে হয়েছিল মানসীর, এই বুঝি সময় হয়েছে, এক্ষুনি, এক্ষুনিই বলে দিতে হবে সব।

বাদাম ভাজা খেতে খেতে হাঁটছিল ওরা গড়ের মাঠে পাশাপাশি। এ্যালবার্ট বলে যাচ্ছিল কত কথা, কত দেশের গল্প। দিল্লী কেমন, আগ্রার তাজে গিয়ে কেন ওর ভাল লাগেনি, একা মনে হয়েছিল বড় ইত্যাদি! মানসী শুনছিল, শুনতে শুনতে ইঁটে পা লেগে পড়ে যাচ্ছিল গর্তে দু'হাত বাড়িয়ে ওকে টেনে তুলল এ্যালবার্ট। বোধহয় মুহূর্তেরই জন্য, বুকের সঙ্গে চেপে রাখল ওকে, আর মুখ নীচু করে ওর ঠোঁটের ওপর চেপে ধরল ওর ঠোঁট। একটা আগুনের হলকা মানসীর মাথা থেকে কান, গলা হয়ে বুকের মধ্যেটা পুড়িয়ে পরিশুদ্ধ করে সারা শরীরে জড়িয়ে গেল আর এ্যালবার্ট তাড়াতাড়ি ওকে ছেড়ে দিয়ে সরে

দাঁড়াল। মানসীর টকটকে লাল মুখের দিকে তাকিয়ে বলল এটা গড়ের মাঠ, ভুলে গিয়েছিলাম. সরি মানসী। কিন্তু আবার ওর নরম হাতটা মুঠি করে ধরেছিল ও, খুব আস্তে প্রায় কানে কানে বলার মত বলেছিল, ভালবাসি. আমি তোমায় ভালবাসি মানসী।

মানসীর চোখ বুঝে এসেছিল, আর যদিও এ্যালবার্টের ঠোঁট নেমে আসেনি ওর ঠোঁটে তবু ক্ষণিক পাওয়া সেই চুম্বন বিদ্যুতের মত তখনও ওর সারা শরীরে শিহরিত হচ্ছিল। শুদ্ধ হলাম, পবিত্র হলাম আবার, মনে মনে বলছিল মানসী, বলছিল ভালবাসি. ভালবাসি। আর তখনই সপাং চাবুকের মত মনে পড়ে গেল, কিন্তু বলতে তো হবে। তুমি আজ পবিত্র করেছ আমাকে, পরিশুদ্ধ করেছ, কিন্তু তার আগে, তার আগে…

কি বলছ মানসী? কি? তার আগে কি? লম্বা এ্যালবার্ট নীচু হয়ে এসেছিল মানসীর মুখের কাছে, কি বলবে বল? তুমি হিন্দু আমি খ্রীশ্চান, এইতো?

মানসী ভাবেনি, বুঝতেই পারেনি তার স্বগতোক্তি শুনতে পাবে এ্যালবার্ট, ওকি মুখ খুলে কথা বলেছিল? কি যেন…

কি মানসী? কি বলছিলে, বড় ভালবেসে বড় নরম গলায় আবার জিজ্ঞাসা করেছিল এ্যালবার্ট।

এই, এই বলছিলাম। তাড়াতাড়ি যেন কথা খুঁজে পেল মানসী। আমরা. আমরা…মানে খুব, খুব গোঁড়া বাড়ীর—

ও কিছু নয়। এ্যালবার্ট খুব সহজেই উড়িয়ে দিল কথাটা, তারপর আবার হাতে হাত জড়িয়ে নিয়েছিল, এখন তো কিছুদিন আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। আমার একটা প্রমোশন হবে, খুব সম্ভব ট্রান্সফারও হব, গোয়ায়।

গোয়ায়?

হ্যাঁ, ট্রান্সফারের দেরী আছে, তবে প্রমোশনের কথাটা জানতে পারব এক সপ্তাহের মধ্যেই, ওটা অবশ্য হবেই। নাইট ডিউটি থেকে

রেহাই পাওয়া যাবে তখন। এ্যালবার্ট বলছিল, যেন স্বপ্নে কথা বলছে। তোমাকে আর খাটতে হবে না, তোমার অফিস ক্লাবে প্রে করা ভালো লাগে না আমার।

তবে কি করব? সিনেমা? খুব আস্তে জিজ্ঞাসা করেছিল মানসী।

না, কিছু নয়। বালিগঞ্জের দিকে বড় ফ্ল্যাট পাব আমি, আমার মাইনে বাড়বে, তোমার বাড়ির সবাইকে নিয়ে একসঙ্গেই থাকতে পারব আমরা।

সত্যি! মানসী নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। এমন কথা তো কেউ বলেনি। যে শম্ভুদা ওদের বাড়ীর সকলকে এত জানে, চেনে, সে আজকাল দেখা হলেই বলে বিয়ের কথা, সেও তো কখনও বলেনি বিয়ে হলে মানসী বৌ সেজে কেবল ঘরেই বসে থাকবে, আর কাজ করতে হবে না তাকে, আর বলেনি যে বাড়ির সকলকে নিয়ে রাখবে একসঙ্গে। সবাই থাকবে তারা—বাবা মা খোকন রাখী মানসীর সঙ্গে, যেমন এখন আছে তারা। জ্যোৎস্নাদি পর্যন্ত আলাদা থাকার কথাই বলেন।

তুমি এত ভাল। খুব আস্তে কানে কানে বলার মত করে বলল মানসী। কিন্তু শুনতে পেল এ্যালবার্ট, মানসীর হাতে জোরে চাপ দিল, এক হাত কোমরে জড়িয়ে আবার একটু টেনে নিল কাছে, বলল, তুমি ভালো, তুমি যে ভালো মানসী।

আমি ভাল? তুমি···তুমি কি জান আমার?

আমি তোমাকে জানি, আর কিছু জানার দরকার নেই আমার।

কিন্তু···

কোন কিন্তু নয়। বেশী কথা বললে আবার কিন্তু এই মাঠের মধ্যেই···মানসীর ঠোঁটের ওপর একটা আঙ্গুল রাখল এ্যালবার্ট, আর কোন কথা নয়। চল এখন, সন্ধ্যা হয়ে এল, আমায় ডিউটিতে যেতে হবে। ট্যাকসি···ট্যাকসি। ট্যাকসিতে উঠে ও হাতে হাত দিয়েই

বলেছিল ওরা সারাক্ষণ, বাড়ির কাছাকাছি এসে সরে বসেছিল মানসী, এ্যালবার্টের চোখ ভালবাসায় কৌতুকে ঝলমল করছিল।

বাড়ীর মোড়ে ট্যাকসি থামিয়ে মানসীকে হাত ধরে নামিয়ে দিল এ্যালবার্ট, বলল কাল বোধহয় অফিসের কাজে বাইরে যাচ্ছি, না গেলে দশটার সময় ফোন করব তোমার কফির দোকানে, নাহলে এক সপ্তাহ পরে এসেই ফোন করব। চলি। হঠাৎ আবার ফিরে দাঁড়িয়েছিল এ্যালবার্ট, খুব খারাপ লাগছে যেতে, বড় মন কেমন করছে, তোমায় যদি নিয়ে যেতে পারতাম…বিয়ের পরে আর একদিনও ছেড়ে থাকবো না, ট্যুরে গেলেও সঙ্গে নিয়ে যাব। তারপরই বড় বড় পা ফেলে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। আর মানসী সেই অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে থাকল অনেক, অনেকক্ষণ। সেদিন রাতে ভাল ঘুম হয়নি মানসীর, কিন্তু কি মধুর সেই জাগরণ।

আর গত দশ দিন ধরে কি এক সুখের পাখী গান শুনিয়েছে সারা দিন রাত, সারা আকাশ কত নীল, বেচারা কি ভাল, কি ভাল মা আর খোকন, রাখী।

সন্ধ্যাবেলা জ্যোৎস্নাদির বাড়ীও যায় নি মানসী, সুরার তৃষ্ণা মিটিয়েছে লেবুর সরবতে, এ্যালবার্ট পছন্দ করে না মদ খাওয়া। আর জ্বালাটাই যখন পুড়ে ছাই, তখন আর কি দরকার তাতে জল ঢালার? যদিও মাঝে মাঝে খচখচ করেছে সেই মন্ত্রটা ফিসফিস করেছে কানের কাছে, বলতে হবে, মন খুলে বলতে হবে এ্যাটবার্টকে। মাথা নেড়ে তাকে থামিয়ে রেখেছে মানসী। বলব, বলব? এ্যালবার্ট তো বলেছে আমায় ও চেনে জানে। তবুও সত্যিই সব খুলে বলেছিল ওকে আজ মানসী।

আজ সকাল আটটার সময়ই 'কাফে-দ্য প্যারিমেক' ছেলেটা ওকে এসে ডেকেছে, ফোন আছে। তাড়াতাড়ি পায়ে চটি গলিয়ে চুলে একবার চিরুণী বুলিয়েই বেরিয়ে এসেছে মানসী। ফোন ধরে শিহরিত

হয়েছে, হ্যাঁ এ্যালবার্ট'দা শম্ভুদা নয়, বোসদাও নন। আর এত ভোরে এ্যালবার্ট ছাড়া আর কেই বা করতে পারে ফোন।

রিসিভারে মুখ রেখে কান পেতে 'হ্যালো' বলেই বিহ্বল মানসী। কি গাঢ় গম্ভীর গলা এ্যালবার্টের। মানসী! এক্ষুনি একবার চলে আসতে পারবে।

এক্ষুনি।

হ্যাঁ মানে যত তাড়াতাড়ি, এই নটা নাগাদ, পারবেনা? কি আকুলতা, গলায় যেন ভালবাসা ঝরে পড়ছে। অসুবিধা হবে খুব? পারবেনা, অস্থির, কেমন দ্রুত যেন এ্যালবার্টের এই কথা বলার ভঙ্গী। কিন্তু আমার যে আর সময় নেই, মানসী?

সময় নেই। এইতো এলে।

হ্যাঁ। আজই আবার চলে যেতে হবে, সময় নেই মানসী, তোমায় একবার আসতেই হবে।

যাচ্ছি, যাচ্ছি। নটার ভেতরই যাচ্ছি, কিন্তু কোথায়?

আমার বাড়ীতে। মানে ফ্ল্যাটে।

ঠিক আছে। খট করে টেলিফোন রেখে দেবার আওয়াজ হয়েছে। আশ্চর্য্য তো। এমন তো এ্যালবার্ট কখনও করে না। বাই বলে, কেমন আছ জিজ্ঞাসা করে, আরো কত কথা। একঘণ্টা পরেই দেখা হবে যদিও কিন্তু অন্যান্য দিন তাতেই কি ছাড়ে এ্যালবার্ট? কি যেন।

বাড়ী এসে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে তৈরী হয়েছে মানসী, বেছে বেছে পরেছে সেই আকাশ নীল হালকা টাঙ্গাইল শাড়িটা। নীল রং বড় পছন্দ এ্যালবার্টের। নকল মুক্তোর মালা পরেছে গলায়, কানে নকল মুক্তোর দুল। তারপর সাদা উঁচু হীলের চটি পরে সাদা ব্যাগ নিয়ে সকালের বাসে প্রথম সিটটাতেই বসতে পেরেছে।

নটার কিছু পরে প্রায় সাড়ে নটায় পৌঁছতে পেরেছে মানসী, আর

এ্যালবার্টের ছু'কামরার ফ্ল্যাটে ঢুকে অবাক। কোনও আসবাব নেই, ঘরে কিছু নেই, একদিকে মস্ত হোল্ডওলে ওর বিছানাটা বাঁধা, আর চারিধারে ছড়ানো ছেঁড়া কাগজ, পুরাণো বই, চটি আর এক সোরাই জল।

এসেছ, তুমি এসেছ। এ্যালবার্ট প্রায় ছুটে এসেছে মানসীর কাছে, ছু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বোধহয় ওকে বুকে টেনে নেবার জন্যই, আর মানসী তো সমর্পিত হতেই এসেছে আজ, কিন্তু সহসাই কেন থমকে থেমে রইল এ্যালবার্টের হাত। আর মানসীর দিকে উল্টো মুখ করে দাঁড়িয়ে যেন আর্তনাদ করে উঠলো এ্যালবার্ট। মানসী। মানসী।

কি? কি হয়েছে। মানসী ছুটে গেছে এ্যালবার্টের কাছে, ছু'হাত দিয়ে ওকে ঝাকিয়েছে, কি? কি হয়েছে? বলবে তো।

একটু সময় নিয়ে স্থিত হয়েছে এ্যালবার্ট, বলেছে, বলব বৈকি, বলবো বলেই তো তোমাকে আজ ডেকেছি এখানে। বোস। ফিকে হেসে বলেছে, বসবেই বা কোথায় এই কাগজগুলোর ওপরই বোস। খবরের কাগজ পাট করে দিয়েছে সামনে। পা ছড়িয়ে জড়ো করা কাগজের ওপর বসেছে মানসী, বল?

মানসী।

উঁ।

মানসী। সহসা হাঁটু মুড়ে মানসীর সামনে বসে ছুহাতে মুখ ঢেকে আহত শূকরের মত আর্ত্তনাদ করেছে এ্যালবার্ট, হোলনা মানসী হোলনা, সব, সব ভেঙ্গে গেল।

ভেঙ্গে গেল। বিস্মিত মানসী। কি। কি ভেঙ্গে গেল।

আমার জীবন। আমার স্বপ্ন, আমার সর্বস্ব, ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল।

কি বলছ? কি, কি হোল।

মুখ থেকে হাত সরিয়ে শুকনো লাল লাল চোখে মানসীর দিকে

পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছে এ্যালবার্ট। মানসী ? আমাদের বিয়ে হবেনা। হতে পারবেনা। আমি···

ওঃ। এই কথা। মানসী ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মত সপাং দাঁড়িয়ে উঠেছে। আমি জানতাম, আমি জানতাম। আমি জানি, আমি বুঝতে পেরেছি, মানসীর কপালে ঘাম, মানসীর হাত হিম, মানসী ফণা তোলা সাপের মত হেলছে দুলছে।

আমি জানি, তুমি কি শুনেছ, হয়ত, হয়ত শম্ভুদাই বলেছে। ও আমায় তোমার সঙ্গে ঘুরতে দেখেছে, আমি জানি, জানতাম।

কি বলছ মানসী।

ঠিকই বলছি আমি, আমি তো তোমায় সব বলতেই চেয়েছিলাম এ্যালবার্ট। আমি তো গোপন করতে চাইনি। তবে, তবে হু হু করে কেঁদে উঠল মানসী, কেন ? কেন তুমি আমায় ডেকে এনে··· কথা শেষ করতে পারলোনা মানসী, দুহাতে মুখ ঢেকে আবার বসে পড়ল মাটিতে সেই কাগজের স্তূপে।

এ্যালবার্ট অবাক হোল সত্যিই, কি বলছ মানসী আমিও কিছুই বুঝতে পারছিনা, তোমার কি ? তোমার সম্বন্ধে আবার কি শুনব ? আমি, আমার নিজের কথা, আমার দুর্ভাগ্য, আমার বিপদ।

বিপদ ! তোমার বিপদ।

হ্যাঁ। এমন অবস্থা যে কারুর কখনও হতে পারে···তুমি শোন মানসী।

মুখ থেকে হাত সরাল মানসী, রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছল, গালের জল মুছল। কি হয়েছে তোমার। কি বিপদ।

মানসী। আমাদের বিয়ে হতে পারেনা।

সে তো শুনলাম। কিন্তু কেন ? কি করেছি আমি।

তুমি কিছু করোনি, হয়ত আমি করেছি।

কি করেছো তুমি।

আমি···আমি ঠিক করিনি—মানে, মানসী। ঘুরে বসে দুহাত

দিয়ে মানসীর দু'কাঁধ জোরে চেপে ধরলো এ্যালবার্ট। মানসী, না জেনে আমি এক ভীষণ জালে জড়িয়ে পড়েছি।

তার মানে।

হ্যাঁ। আমি জানতাম না, আমার এই চাকরী, এই প্রমোশন সব এখন মিথ্যার ওপর।

তোমার চাকরী গেছে ?

এ্যালবার্ট ধীরে মাথা নাড়ল। না। প্রমোশন হয়েছে, মাইনে বেড়েছে।

তবে।

মানসী। চাকরী গেলেই আমি খুশী হতাম বেশী, যে কোন ভাবে, রিকসা টেনে মোট বয়েও উপার্জন করতে পারতাম আমি··· কিন্তু—

কিছু বুঝতে পারছিনা আমি—

বোঝাতে বোধহয় পারবও না। মানসী, যেখানে আমি চাকরী করি, তাদের একস্‌পোর্টের ব্যবসা এ সব ভাঁওতা, আসলে এরা স্মাগলার, এরা চোরা কারবারী।

স্মাগলার! চোরা কারবারী!

হ্যাঁ। আমি এবার বোম্বে গিয়েই বুঝতে পেরেছি, তক্ষুণি ভেবেছি ছেড়ে দিই।

দিলেনা কেন। মানসী যদিও ব্যাপারটা ভাল বুঝতে পারছেনা, তবু অস্পষ্ট ভাবে মনে হচ্ছে কি যেন সব গোলমাল, থানা, পুলিশ। তাই বলল, দিলেনা কেন ছেড়ে ?

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল বিষন্ন এ্যালবার্ট। ছাড়তে চাইলেও যদি ছাড়া যেত মানসী! আমি না জেনেও ওদের সঙ্গে জড়িয়ে গেছি, এখন ওরা আমায় সরে আসতে দেবেনা. আমার লেখা, সই করা কাগজ সব আছে ওদের কাছে, হয়ত পুলিশের খাতাতেও।

পুলিশ। মানসীর বুকের স্পন্দন দ্রুত হোল। কি বলছ তুমি : সত্যি পুলিশ ধরবে তোমায়।

ধরুক, তাই আমি চাই।

না, না, পুলিশ ধরবে কি।

হাসল এ্যালবার্ট। আর ক্লিষ্ট, করুণ সেই ঈষৎ হাসির রেখা মানসীর বুকের ফলকে যেন আঁকা হয়ে গেল চিরদিনের জন্য।

পুলিশ কোনদিন হয়ত আমায় ধরতে পারে, কিন্তু এখনোও ধরেনি, বা এক্ষুণিই ধরবেও না।

ধরা ধরা গলায় একটু হাসির মত ঠোঁটের ভঙ্গী করল মানসী। তবে। তবে কেন···

মানসী। অনেক কথা। যদি কোনদিন সময় পাই, হয়ত তোমায় বুঝিয়ে বলব, আজ সময় নেই, শুধু এটুকু বিশ্বাস কর আমি জানতাম না, আমি সত্যিই কিছু জানতাম না, আমি আপ্রাণ খাটতাম প্রমোশনের জন্য, চাকরীতে উন্নতির জন্য, কিন্তু কিন্তু।

গলা ভেঙ্গে এল এ্যালবার্টের, আমি কোনদিন বুঝতে পারিনি, কখনও জানতে পারিনি। আবার দু'হাতের মধ্যে মুখ ঢাকল এ্যালবার্ট, উঃ।

মানসী ওর সরু লম্বা আঙ্গুল দিয়ে এ্যালবার্টের মাথার চুলে নিঃশব্দে অনেক ভালবাসা ঝরিয়ে দিল। ধীরে বলল ওঠ। শান্ত হও।

আস্তে মুখ তুলল এ্যালবার্ট। বলল, আজ আমি বেরুতে চেষ্টা করলেও বেরুতে পারবোনা, হয়ত তাহলে আমায় মেরেই ফেলবে ওরা।

মেরে ফেলবে? ছোট একটা আর্তনাদকে ঠেলে গলার নীচে পাঠিয়ে দিল মানসী।

হ্যাঁ, তাই। মানসীর হাতের ওপর হাত রাখল এ্যালবার্ট। তাই প্রমোশন নিয়ে আজকের ট্রেনেই বম্বে যেতে হচ্ছে, আরোও অনেক গভীর জড়িয়ে পড়ার জন্য।

না, না। হঠাৎ মানসী চীৎকার করে কেঁদে উঠল। আমি তোমায় যেতে দেবনা, দেবনা।

মানসী প্লিজ। তুমি এরকম কোরনা, বুঝতে পারছোনা কেন, তোমায় এরকম দেখলে আমার মন আরোও দুর্বল হয়ে যাবে। আমি হয়ত যেতে পারবোনা…

ভালইতো হবে।

ভাল হবেনা মানসী। তুমি জাননা, তাছাড়া…

মানসীর হাত ছেড়ে সোজা হয়ে বসল এ্যালবার্ট, তোমাকে আমি এর মধ্যে জড়াতে চাইনা মানসী, তোমাকে আমি এর মধ্যে টানতে পারিনা। তুমি যে ভোরের ফুল।

না না। মানসীর মাথা নেমে এল এ্যালবার্টের কোলের ওপর। আমি কি, তুমি তো জাননা। তুমি তো জাননা আমার সব ইতিহাস।

জানিনা, কিন্তু তোমায় জানি। তোমার ইতিহাসে আমার দরকার নেই, হয়ত কোন ভুল করেছ পয়সার লোভে, হয়ত কোন অন্যায় করতে হয়েছে বাধ্য হয়ে…

না, না। শোন তুমি, শুনতেই হবে তোমায়, যাবার আগে জেনে যেতেই হবে, না বললে শান্তি হবেনা আমার।

বেশ বল। শান্ত হয়ে বসেছে এ্যালবার্ট, দেয়ালে ঠেস দিয়ে। ধীরে ধীরে স্পষ্ট ভাষায় মানসী বলছে সে রাতের সব কথা। কাহিনী শেষ করে মানসী নেমেছে, পাশের সোরাই থেকে জল গড়িয়ে ঢক ঢক খেয়েছে এক গ্লাস, তারপর বড় বড় কালো চোখ মেলে চেয়েছে এ্যালবার্টের মুখে এবার।

লম্বা একটা নিঃশ্বাস। দু'চার মুহূর্ত এ্যালবার্ট চুপ। তারপর হাত বাড়িয়ে মানসীর চিবুক তুলে ধরে আস্তে নীচু হয়েছে ওর ঠোঁটের ওপর বলেছে, সত্যিই তুমি ভোরের ফুল। তোমার গায়ে কোন কাদা লাগেনি মানসী।

সত্যি বলছ! আমার গায়ে কাদা লাগেনি, আবার একটু থেমে আরও নীচু স্বরে বলেছে আমি ও অবশ্য এখন ভুলেই গেছি—তবু।

হ্যাঁ। ভুলে যাও, একেবারে ভুলে যাও।

ঘড়ি দেখল এ্যালবার্ট। মানসী। সময় হয়েছে যে, এবার আমায় যেতে হবে।

এক্ষুণি।

অনেকক্ষণ হয়ে গেছে মানসী। আমাকে একবার অফিস যেতে হবে, সেখান থেকে কাজ সেরে টিকিট নিয়ে তবে। এ্যালবার্ট উঠে দাঁড়াল।

মানসীও উঠল, আবার কবে আসবে।

আবার। এ্যালবার্ট সেই আশ্চর্য্য হাসিটা হাসল। আরতো আমি আসবোনা মানসী। আর কোনদিন তোমায় দেখতে পাবনা।

না, না। বোলনা।

মানসী ভাল করে থেক। কোন ভাল ছেলেকে বিয়ে করো। তোমায়, তোমায় কত ভাল লোক বিয়ে করতে চাইবে।

না, না। তুমি এসব কথা বোলনা, আমি তোমায়, তোমায় চাই।

এ্যালবার্টের চোখ দিয়ে ঝরঝর জল পড়ে মানসীর গাল ভিজিয়ে দিল। ভেজা ঠোঁট মানসীর গালে চোখে চুমু খেল এ্যালবার্ট। মানসী। যদি কোনদিন এ জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারি তবেই তোমায় দেখা দেব,···কিন্তু, কিন্তু তাকি কখনোও পারব?

মানসী নিঃশব্দে বাহু-বন্ধন নিবিড় করল, আমি, আমি অপেক্ষা করব।

না মানসী না। কতদিন অপেক্ষা করবে তুমি? যদি, যদি কোনদিনও না বেরুতে পারি।

না, না বোলনা, এ'কথা বোলনা। তুমি নিশ্চয় বেরুতে পারবে।

বলছ। বলছ তুমি। আমি পারব, পারব এদের হাত থেকে বেরিয়ে আসতে।

হ্যাঁ! নিশ্চয় পারবে।

ছেলে মানুষ। ছেলেমানুষ। বারবার মাথা নেড়েছে এ্যালবার্ট। আমি বম্বে যাচ্ছি মানসী, সাজানো ফ্ল্যাটে, এয়ার কণ্ডিশানড, টি, ভি, গাড়ী…না মানসী না। আমি জানি আমার আর কোনদিন ফেরা হবেনা।

জোর করে মানসীর হাত ছাড়িয়ে নিয়েছে এ্যালবার্ট, মানসী ভাল থেকো, ঠিক থেকো, ছাড় আমায় ছাড়, বাড়ী চলে যাও। চল তোমায় ট্যাকসীতে উঠিয়ে দিয়ে আসি।

মানসী আর একটা কথাও বলতে পারেনি, নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলেছে ট্যাকসি লাগবেনা তুমি ভেতরে যাও।

মানসী।

আর ডেকোনা। রুমালে মুখ মুছে এক বারও ফিরে না তাকিয়ে গট গট রাস্তা হেঁটেছে মানসী। কখনও রোদ, কখনও মেঘ, মানসী রাস্তাই হেঁটেছে। কোথায় যাবে? কতদূর? কোথায় যেতে চায় মানসী? তাতো জানেনা, মানসী যেতে চায় অনেক দূরে, কোথায়? সেই 'তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি' সেই উদার উন্নত দেওদার বনে না মস্ত সেই পাহাড়ের মাথায়, কোথায় সে কোথায়? কার কাছে যাবে মানসী। জানেনা মানসী জানেনা, কিন্তু যেতে তো ওকে হবেই।

ঝিরঝির বৃষ্টি এল আবার। আষাঢ়ের মেঘ, ওকে ভেজালোনা, কেবল একটু শীতল করে দিয়ে গেল। মানসী একটু দাঁড়িয়েছিল, কোনও পুতুলের দোকান হবে সেটা। বিস্ফারিত চোখে অপরূপ দেহ-সৌষ্টব নিয়ে বিদেশিনী পুত্তলিকারা যেন দেখছে মানসীকে। ইমপোর্টেড। কাণে এলো কথাটা। দোকানের মালিক বলছেন হেসে হেসে, যা দেখছেন এখানে সব ইমপোর্টেড। নিন না, আসুননা, ভেতরে আসুন। সব ইমপোর্টেড।

ইমপোরট একস্‌পোরট। সেইতো ব্যবসা এ্যালবার্টের কম্পানীর তাই না। ধরিয়ে দেবে, ধরিয়ে দেবে মানসী, এখুনি পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেবে। মানসী প্রায় ছুটে বেড়িয়ে এলো দোকান থেকে. পিছনে দোকানের মালিক তখনও বলছেন, আরে নাই নিতেন বৃষ্টিতে বেরুলেন কেন ? ভিজে যাবেন যে। আসুন আসুন।

কিন্তু বৃষ্টিকে ভয় করেনা মানসী, বৃষ্টিকে মানসী ভালবাসে। যদিও রাস্তায় ঠিক ভেজা যায়না, কিন্তু এ বৃষ্টিতে শাড়ী তেমন ভিজবেনা আঁচলটা গায়ে ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে মানসী আবারও হাঁটতেই থাকল। ছ'একটা রিকসা ঠুন ঠুন বাজাল সামনে এসে, কিন্তু মানসী থামলনা, দেখলোনা। কতক্ষণ হেঁটেছে মানসী, কত যুগ যুগান্তর ? কাণের কাছে একি কলস্বরে অভ্যর্থনা, আয় আয়। কোথায় ছিলি এতদিন।

মানসী ও অবাক তাকিয়ে আছে জ্যোৎস্নাদির দিকে। আশ্চর্য্য ! এত পথ হেঁটে হেঁটে ও তাহলে জ্যোৎস্নাদির কাছে ফিরে এসেছে আবার।

মুখ এত শুকনো কেন ? জ্যোৎস্নাদি বলছেন শুনতে পেল মানসী সারাদিন কিছু খাসনি বুঝি ? আব্দুল…।

মানসী চোখ বুজে মাথা হেলিয়ে দিয়েছে কুশানে, আর জ্যোৎস্নাদি ব্যস্ত পায়ে নিয়ে এসেছেন গরম মাছ ভাজা, সন্দেশ, মাখন দিয়ে লাগান টোষ্ট। তারপর হেসে বলেছেন কি চাই এবার ? চা না গেলাস ?

চা প্রেমী মানসী চা বলতে গিয়েও আটকে গেল। না চা নয়, কড়া করে এক পেগ ব্র্যাণ্ডি।

কড়া করে ব্র্যাণ্ডি ? ও বাবা। খুব হেসেছেন জ্যোৎস্নাদি ব্যাপার কি ? ছোঁড়াটা কেটেছে বুঝি ? মানসী কিছু বলার জন্য জন্য মুখ তুলেছে, আর ওর টলটলে মুখ, জল ভেজা চোখ দেখে জ্যোৎস্নাদি একটু চমকেছেন।

কি হয়েছে রে। ওর মাথাটা নেড়ে দিয়েছেন একটু। আর

জলে ভেজা গাছ বাঁচানোর মতন ঝরঝরিয়ে জল করে পড়েছে আবার মানসীর চোখে।

জ্যোৎস্নাদি! প্রায় আর্ত্তনাদের মতই শুনিয়েছে মানসীর ডাক। জ্যোৎস্নাদি নীচু হয়ে মানসীর মুখ বুকে চেপে ধরেছেন, কি হয়েছে রে। বল, আমাকে বল।

তখন, জ্যোৎস্নাদির বুকে মুখ রেখে সব বলেছে মানসী। জ্যোৎস্নাদি মাঝে মাঝে ওর মাথায় হাত রেখেছেন, পুওর গার্ল, পুওর ডার্লিং বলেছেন অনেকবার। অবশেষে বলেছেন, যা স্নান সেরে আয় আগে, ভেবে তো কোন লাভ নেই, যা হবার তা হবেই। নিয়তি। সে চলে গেছে তার নিজের কাজে, কিন্তু তোকে তো বাঁচতে হবে। ওঠ, স্নান সেরে নে। আমি বাথটব ভরেই রেখেছি চটপট স্নান সেরে বসার ঘরে চলে আয়, আব্দুল গরম কাবাব ভাজছে, কাবাবের সঙ্গে কড়া করে ব্রাণ্ডি। কেমন? যা স্নানে যা। ঠেলে ওকে স্নানের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন জ্যোৎস্নাদি, আর সেই সুগন্ধি ঈষৎ জলে স্নান সারার পর সত্যিই একটা প্রশান্তি, একটা স্নিগ্ধতার আমেজ এসেছে, শুধু শরীর নয় মনেও।

ঘড়ি দেখেছে মানসী, এ্যালবার্টের ট্রেণ ছেড়ে গেল এতক্ষণে হাওড়া ষ্টেশন। কি মুস্কিল চোখ জ্বালা করে খালি জল আসে কেন চোখে? এ্যালবার্টকে সত্যিই কি ও এত ভালবাসে? কবে থেকে ওকে এত ভালবাসল মানসী। কখন? সেই গড়ের মাঠে সেই সন্ধ্যার পর থেকে? অর্থাৎ এই গত দশদিনে? জলঝরা নিজের নগ্ন প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল মানসী। না দশদিন নয়। বোধহয় অনেক অনেক দিন থেকেই গত এক বছর ধরেই ধীরে ধীরে ওকে ভালবেসেছে মানসী। ধীরে ধীরে, অতি ধীরে কখন যেন সেই রমণীয় কান্তি সুদর্শন সুশোভন চোখের ছবিটা মুছে গেছে, মিলিয়ে গেছে পশ্চাৎ পর্বে, আর দীর্ঘ-সবল শ্যামকায় এ্যালবার্টের ছবিটা ফুটে উঠেছে জোরাল রেখায়। এই রূপান্তর, এই বিপুল পরিবর্ত্তন কেমন

করে হোল বোঝেনি মানসী, কিন্তু গভীর যন্ত্রণার মধ্যে নিবিড় ব্যথার সঙ্গে আজ বড় তীব্র করেই বুঝেছে মানসী—বুঝেছে এ্যালবার্টকে ও ভালবাসে, এই বুঝি প্রেম। এত কষ্ট, এত দুঃখ একে বল ভালবাসা। চায়না চায়না মানসী ভালবাসতে প্রেমে পড়তে চায়না মানসী। মানসী সুখের প্রত্যাশী—সুখ চায় মানসী, আরাম চায়, আর চায় নিরাপদ আশ্রয়। আর সেই সুখের আশায় সেই নিরাপদ একটু আশ্রয় তৈরী করার জন্যইতো টাকা উপায়ের চেষ্টা, বোসদা, শম্ভুদা, বাবা আর অবশেষে জ্যোৎস্নাদি। হঠাৎ মনে পড়লো মানসীর এ্যালবার্ট বারবার বারণ করেছে ওকে, যাবার আগেও, জ্যোৎস্নাদির ওখানে যেওনা মানসী, ওরা লোক সুবিধার নয়, কোনদিন কি যে হবে।

আর কি হবে আমার এ্যালবার্ট, আর কি হবে। জ্যোৎস্নাদির কাছে না আসলে কোথায় যাব আমি, আর কে আছে আমার বন্ধু ? আমি তো জয়ন্তী নই, যার তুচ্ছতম সাধ পূরণ করতে আছে বাবা, কাকা, দাদা। অর্থের কি প্রয়োজন সে জানেনা, কোনদিন তাকে উপার্জন করতে হয় না, তবু তার ব্যাগ ভরা রাশি রাশি টাকা। বিয়ে ঠিক হয়ে আছে তার বাবা মার পছন্দ করা পাত্রের সঙ্গে। বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে হাসিমুখে যাবে বিলেত। এ'পাড়ায় আসার পর, জয়ন্তীর সঙ্গে ভাব হবার পর প্রায় রোজই যেত মানসী জয়ন্তীদের বাড়ী। জয়ন্তীর মা বাবা কাকা সবাই ভালবাসতেন মানসীকে। ওদের গাড়ী করে বেড়াতেও গেছে কতবার। আজকাল লজ্জা করে মানসীর ওদের বাড়ী যেতে। ওরা অবশ্য, কি করে মানসী, কি ঘটে গেছে মানসীর জীবনে কিছুই জানে না। আর জয়ন্তী এখনও ওকে দেখলে হৈ হৈ করে অভ্যর্থনা করে, হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়, বৌবাজার থাকে ; চীৎকার করে ডেকে বারবার বলে, মা দেখ, দেখ। মানসীটা কি দারুণ দেখতে কি ফর্সা রং। মা বলেন ও তো বরাবরই এমনই সুন্দর। কি লক্ষী ঠাণ্ডা মেয়ে, তোমার মত ধিঙ্গী নয়।

বেশ, ধিঙ্গী তো ধিঙ্গী। বলে প্যান্টপরা পা টেবিলের ওপর

তুলে জয়ন্তী পা নাচায়, বলে, এই ! সিগারেট খাবি। আরো কত কি যে বকে যায় জয়ন্তী, আর মানসী বোঝে খুব গভীর ভাবেই বুঝতে পারে, যে মানসীর মত জয়ন্তীর মনে কোন ভয় বাসা বেঁধে নেই। ও নির্ভার, নির্ভয়। ওর হা-হা হাসি বেপরোয়া খরচ করা, আর সিগারেট টানা দেখলেই বোঝা যায়, ও মুক্ত, স্বাধীন। কিন্তু মানসী তো ওর মত খুশী থাকতে পারে না, পারে না স্বাধীনতার স্বাদে পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোয় আনতে। তাই সেই ভয় ভুলতে, একটু প্রশ্রয় পেতে মানসী জ্যোৎস্নাদির কাছে আসে। কই ! এই দশদিনে তো ও একবারও জ্যোৎস্নাদির বাড়ী আসেনি। মনেই হয়নি ওর জ্যোৎস্নাদির কথা। কারণ, কারণ এই দশদিন তুমি ছিলে এ্যালবার্ট মানসীর পরিত্রাতা, রক্ষক রূপে। তুমি বলেছিলে সবাইকে নিয়ে নতুন একটা বাড়ীতে নতুন জীবন সুরু করব মানসী। সেখানে জয়ন্তীর বাবার মত তুমিই সব ভার নেবে. মানসীকে ভাবতে দেবে না। আর তাই দশদিনের মধ্যে তিনদিন মানসী গেছে জয়ন্তীর বাড়ী, গুণগুণ গান গেয়েছে সদ্য শোনা জয়ন্তীর কেনা রেকর্ডের, বারবার করে আঙুল বাড়িয়েছে, কাপড় জামা কেচে পাট করে নিশীথ বাবুদের গদির তলায় ইস্ত্রির জন্য রেখে এসেছে,.আর দুপুরে খাবার পর জয়ন্তীর কাছ থেকে আনা বই পড়েছে। আর বই পড়তে পড়তে, খোলা জানলা দিয়ে নানা রং-এর আকাশ দেখতে দেখতে কি ভালোই যে লেগেছে। এমনি করেই তো এখন থেকে আমার দিন যাবে। বারবার বলেছে মানসী নিজেকে। মিষ্টি করে হেসেছে বাবার দিকে চেয়ে, খোকন আর রাখীকে আজব দেশে অমলা পড়ে শুনিয়েছে আর আটটার সময় খোকন রাখীর সঙ্গে বসে মার হাতের গরম গরম রুটি খেয়ে বিছানায় শুয়ে গল্প করেছে বাবা-মা'র সঙ্গে। কিন্তু আজ। আজ যে মুহূর্তের মধ্যে দশদিনের ছবিটা তুমি উল্টে দিলে এ্যালবার্ট, সব যে আগের মত হয়ে গেল। গেল মানসীর স্বাধীনতা, গেল নিশ্চিন্ত সুখ। মানসী আবার জলজ লতার মত অবলম্বনহীন, ভাসছে আর ভাসছে। সেই

ভাসতে ভাসতেই যেন কেমন করে জ্যোৎস্নাদির ঘাটে এসে ভিড়ল। ও তো ভাবেনি এখানে আসবে। আশ্চর্য্য। লম্বা একটা নিঃশ্বাস পড়লো মানসীর। আয়নায় আবার দেখলো নিজেকে। নাঃ চোখের জলের দাগ আর নেই, সব ধুয়ে গেছে দামী বিলিতি সাবানে। বড় তোয়ালে দিয়ে মানসী ধীরে ধীরে জল মুছে গায়ে পাউডার ছিটোল, তারপর পোশাক পরে এসে বসলো প্রসাধন করতে।

মানসী চোখে কাজল টানতে টানতেই জ্যোৎস্নাদি নিজেও নিয়ে এলেন ট্রে। ড্রেসিং টেবিলের ওপরই বিন্দুমাত্র শব্দ না করেই কাঠের ট্রেটা নামালেন। ছুরি দিয়ে গেঁথে গরম শীক কাবাব এক খণ্ড তুলে দিলেন মানসীর মুখে। গোটা কয়েক খেয়ে নে আগে, তারপর এই তোর কড়া ব্রাণ্ডি। বরফের টুকরো ভাসা ঈষৎ পীতাভ উজ্জ্বল পানীয় এগিয়ে দিলেন সামনে। বললেন, ওরা সব এসে গেছে, তুই একটু তাজা হয়ে চট করে চলে আয়। আর কত দেরী হবে।

নাঃ। দেরী কিসের। কি পরবো জ্যোৎস্নাদি। কি পরবি? তোয়ালে মোড়া মানসীর দিকে চেয়ে চোখ ছোট করে হেসে বললেন. এই বেশেই যদি যেতে পারিস তো···

যাও। দিন রাত ফাজলামী ভাল লাগে না, বলনা জ্যোৎস্নাদি···

কি পরবি। এক ঝটকায় আলমারীর পাল্লা খুলে ফেললেন জ্যোৎস্নাদি, দ্রুত হাতে ঝোলান শাড়ী সরাতে সরাতে হঠাৎ মনে যেন একটু ভেবে নিলেন, তারপর ও উজ্জ্বল লাল শিফন টেনে বার করে আনলেন। এই নে।

এটা তো নতুন মনে হচ্ছে। আগে তো কখনও দেখিনি।

হ্যাঁ। নতুনইতো। তোর জন্যই রেখেছি।

আমার জন্য! খুশী, কিছু বিশ্বাসের অভাব, কিছু উত্তেজনা মানসীর প্রশ্নে।

হ্যাঁরে। এই ত্যাখনা। তোর ব্লাউজও তো করিয়ে রেখেছি। আলমারীর কোন থেকে লাল ব্লাউজ আর লাল পেটিকোট বার করলেন

জ্যোৎস্নাদি। তোকে পূজোয় দেব ভেবেছিলাম। শাড়ীটা হঠাৎ খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল, বুড়ো বয়সে আমি তো আর এমন টুকটুকে লাল রং পরতে পারি না, তাই তোর কথা ভেবেই নিয়েছি, পছন্দ হয়েছে···পছন্দ? শাড়ীর সোনালি পাড়ের ওপর হাত বুলিয়ে মানসী বললো, পছন্দ কি বলছ জ্যোৎস্নাদি, লাইক এ ড্রিম।

ড্রিম। তাই নাকি?

সত্যি জ্যোৎস্নাদি তুমি কি করে জানলে এমনি একটা লাল শিফন জয়ন্তীর দেখে আমার যে কি ভীষণ, ভীষণ ইচ্ছে হয়েছিল···ভাবতেই পারিনি যে আমার সেই সাধ পূরণ হবে কোনদিন।

হবে, হবে। তোর সব সাধই পূরণ হবে। লাল নীল, শিফন, সিল্ক, গা ভরা গয়না, আলমারী ভরা টাকা আর, দাঁতে ঠোঁট চেপে ভারী একটা রহস্যময় ভঙ্গী করলেন জ্যোৎস্নাদি, টুকটুকে একটি বরও হবে গো হবে।

যাও। মানসী আস্তে ঠেলে দিল জ্যোৎস্নাদিকে। বরের কথা এখন ওর সত্যিই শুনতে, ভাবতে ভাল লাগছে না।

যাই, তুই আয় চটপট, দেরী করিসনি আর। জরির আঁচল দুলিয়ে জ্যোৎস্নাদি চলে গেলেন, মানসী নরম শাড়িটায় আর একবার হাত রাখল।

আরো কয়েকটা কাবাব খেল মানসী, আর এক পেগ ব্রাণ্ডি। আঃ! মাথাটা বেশ ঝরঝরে লাগছে এখন।

সাজ শেষ করে মানসী শোবার ঘরে ঢোকা মাত্র একটা উল্লাস, সমবেত কণ্ঠের হৈ হৈ মানসীকে অভ্যর্থনা জানাল। ড্রেস টু কিল? মিঃ ঘোষ বারবার বললেন। আহ্বান জানালেন মানসীকে নিজের পাশে বসতে।

কাবাব এল আরো, ব্রানডি এল, তিন পাত্তির খেলা ঘেরা টোপের আলোর তলায় জমে উঠলো ভারী। বারান্দা থেকে ভিজে হাওয়ার হাসনুহানার গন্ধে মাথা ধরাটা মানসীর একেবারেই ছেড়ে গেল,

মানসীর কোলের কাছে জেতা টাকার অঙ্কটাও আজ বেশ ভালই। বাঃ। বেশ লাগছে এতক্ষণে। যাও এ্যালবার্ট, যাক সুশোভন, একা জ্যোৎস্নাদিই মানসীর সব অভাব দূর করে দেবে, মুছিয়ে দেবে সব জ্বালা।

মানসী দাঁতে ঠোঁট টিপে মধুর হেসে তাস ফেলল, মিঃ বোসের হাতে ধরা গ্লাসে মুখ নামিয়ে এক চুমুকে পান করলো অনেকটা। জ্বলতে জ্বলতে বুকের মধ্যে নামে বটে, কিন্তু বুকের সব জ্বালা জুড়িয়ে দেয়। জ্যোৎস্নাদি বলেন ঠিক, মানুষ বেইমানি করে, কিন্তু এ কখনও বেইমানি করবেনা, তোকে সুখ দেবে চিরদিন, সব জ্বালা জুড়িয়ে দেবে।

হঠাৎ জ্যোৎস্নাদির বুড়ো নেপালি মালি বাহাদুর নিঃশব্দে দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকল। মানসীর পাশ দিয়ে জ্যোৎস্নাদির স্বামী নিশীথ বাবুর কাছে গিয়ে ঘাড় নীচু করে ফিসফিস করে কি যেন বলল। হাতের তাস ফেলে লাফিয়ে উঠে পড়লেন নিশীথদা, টেবিলের তাস, পাশে রাখা টাকা পয়সার স্তূপ অঁাজলা করে তুলে ঢেলে দিলেন জ্যোৎস্নাদির অঁাচলে। পুলিশ, পুলিশ, দু'একবার শব্দটা শুনল মানসী, তারপরই মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল সামনের দৃশ্যপট।

অতিথির দল কেমন করে কোথায় যে অদৃশ্য হোল কে জানে, মানসীর খালি চোখে ভাসে জ্যোৎস্নাদি ওকে স্নানের ঘরের লুকোন দরজা খুলে পুরনো লোহার সিঁড়ির কাছে টেনে আনছেন, বলছেন, ফিসফিস করে বলছেন, বাইরের দিকে নামিসনি, একেবারে মালীর ঘরের মধ্যে নেমে বেরিয়ে বাড়ী চলে যা। বাহাদুর চেনা ট্যাকসিতে তুলে দেবে তোকে।

কয়েকটা দিন আসিস নি এদিকে, আবার সব ঠিক হয়ে গেলে··· দলা পাকানো কয়েকটা নোটও তারই মধ্যে, ব্লাউজের মধ্যে গুঁজে দিয়েছিলেন।

কয়েক দিন পরে—সব ঠিক হয়ে গেলে আবার আসিস বলেছিলেন

জ্যোৎস্নাদি, কিন্তু মানসী জানে, আর কোনদিন, কখনই মানসী দাঁড়াবেনা সেই সুন্দর সাজান স্নান ঘরে, বাথটবের সুগন্ধী ঈষৎ নীলাভ জলে গা ডুবিয়ে মন ভাসিয়ে দেবেনা, উঁচু পাহাড়ের ঘন পাইন বনের স্বপ্ন দেখবেনা শোবার ঘরের লম্বা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে।

চোখে জল আসে মানসীর। সুশোভন, এ্যালবার্টের মত জ্যোৎস্নাদির অধ্যায়ও শেষ হয়ে গেল মানসীর জীবনে।

সব ঠিক হয়ে গেলে—কয়েকদিন বাদে আবার আসিস। কি ঠিক হয়ে যাবে জ্যোৎস্নাদি? কয়েক দিন বাদে সব ঠিক কি করে হবে? মানসী জানতোনা, জেনে ফেলেছে, পুলিশ। অর্থাৎ থানা, হাজত, হাতকড়া আর জেনে ফেলেছে ঐ টাকা জেতা, ঐ খেলা, ঐ আনন্দের উত্তেজনা সবের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মস্ত হ্যাঁ, সেই ভয়। সেই যা করতে নেই তাই করা বিপদকে ডেকে আনা। এ্যালবার্টের সাবধান বানী মনে পড়ে যায়, আজ বুঝতে পারে মানসী, কেন মানসীকে জ্যোৎস্নাদির বাড়ী যেতে বারণ করত এ্যালবার্ট। জানতো, ও জানত, কিন্তু কেমন করে। কে জানে। নিজে জালে জড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু মানসীকে মুক্ত দেখতে চেয়েছে ও। চেয়েছে মানসীর স্বাধীন সুখী জীবন। এ্যালবার্ট এ্যালবার্ট। বালিশে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকল মানসী।

*   *   *   *

পকেট থেকে রুমাল বার করে অতি যত্নে ঘাসের ওপর সেই রুমাল বিছাল শম্ভু, পাশে দাঁড়ান মানসীকে বলল, এবার বোস। রুমালটা বড় আছে শাড়ীতে ময়লা লাগবেনা।

লাগুক। লাগুক ময়লা, কাগজের ঠোঁঙা থেকে ঝাল কালো মশলা মুড়ি মুঠি ভরে বার করল মানসী আঃ। দারুণ মেখেছে মুড়িটা। ও শম্ভুদা কোকোকোলা, না না সেভনটি সেভেন খাওয়াবে না?

ডাকছি, ডাকছি। ব্যস্ত কেন! বোস দিকিন আগে একটু সুস্থির হয়ে।

না, এখন বোসবোনা। আদুরে মেয়ের মত গলা করল মানসী। পুচকা খাব, থামস আপ খাব, আলু টিকিয়া খাব, তারপর এসে বসব। অনেকক্ষণ বসব কিন্তু, ও শম্ভুদা শুনছো তো।

বাঃ। শুনছি না তো কি?

অনেক ভীষণ দরকারী সব কথা আছে আমার তোমার সঙ্গে বিশ্বাস করো।

বিশ্বাস করি বৈকি মাণি। না হলে তোমার একটা টেলিফোন পেয়েই চলে এলাম কেন? আজ প্রায় দু'বছর তোমাদের এই রাস্তাই মাড়াইনি আমি। বাবাঃ। ছোঁড়াগুলো মানুষ নয়তো, যেন এক একটা নেকড়ে বাঘ। অনেক ভাগ্যে সেদিন প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিলাম। শম্ভুনাথ বাঁহাত তুলে ঘাড়ের চুলে হাত বোলাল। উঃ। কি দিন যে গেছে আমার। মাইরি। বিচ্ছু বটে তোমাদের পাড়ার ছেলেগুলো।

যেতে দাও। শূন্য ঠোঙা ঘাসে ফেলে রুমালে হাত মুছল মানসী।

হ্যাঁ। ওসব আমিও ভুলেই গেছি। আর এখন কেউ সাহসই

করবে না আমার গায়ে হাত দিতে, বল। শম্ভুনাথ সগর্বে মানসীর চোখে চোখ রাখল।

ভাল করে শম্ভুনাথকে একবার দেখে নিল মানসী। এই দু'বছর শম্ভুনাথ কিছু মেদ বৃদ্ধি করেছে। সেই জিরজিরে ভাবই আর নেই। কোঁচান ধুতির বদলে টেরিলিনের প্যান্ট, আমেরিকান ছাপের বুশ সার্ট পরণে। চশমাটাও বদলে নিয়েছে। মোটের ওপর চেহারায় বেশ একটা নতুন টাকা নতুন টাকা ভাব।

বোস। বোস। আবার বলল শম্ভুনাথ। বোস দিকিনি এখেনে আমার পাশে। মানসীর হাত ধরে ঘাসে পাতা রুমালের ওপর বসিয়ে দিল শম্ভুনাথ। বল। তোমার যা কিছু বলার আছে বল। তোমার টেলিফোন পেয়েই কাজ ফেলে রেখে ছুটে এসেছি আমি। মমতায় ভালবাসায় শম্ভুনাথের মুখটা ভারী কোমল, স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে এখন। ইস। কতদিন। কতদিন পর মানসীকে এভাবে এত কাছে দেখল শম্ভুনাথ। এক বছরেরও বেশী বোধহয়। একটু রোগা লাগছে মানসীকে কিন্তু আরও যেন সুন্দর, আরো যেন টান বেড়েছে চেহারায়। নাকি। এ টান শম্ভুনাথের মনের? বুকের কাছে ব্যথার মত একটা ভাললাগা শম্ভুনাথকে কেমন বেসামাল করে দিচ্ছে।

দু'বছর আগেই শম্ভুনাথ বিয়ে করতে চেয়েছিল মানসীকে, মানসী অবশ্য আমলই দেয়নি। কিন্তু তখনও মানসীকে দেখলে বুকে এমন টান ধরতো না। ভাল মানসীকে ওর বরাবরই লাগে, আর এমন সুন্দরী মেয়েকে ভাল লাগবে এ আর কি নতুন কথা? তবে গোড়া থেকেই যে শম্ভুনাথ ভেবে রেখেছিল যে মানসী ওর বৌ হবে তার প্রধান কারণ অবশ্য ছিল অন্য। শম্ভুনাথ নিশ্চিন্ত করে জানত, বুঝেছিল যে মানসী এক মস্ত ফিল্ম ষ্টার হবে, আর তখন স্ত্রীর টাকাতেই শম্ভু-নাথের বড় বাড়ি হবে, গাড়ী হবে, শম্ভুনাথ বড়লোক হবে। আর সেই ভেবেই তো মিঃ ভোঁসের কাছে······সব গোলমাল হয়ে গেল। তখন কিন্তু আর মানসীর উপার্জনের টাকায় বড়লোক হবার স্বপ্ন

দেখেনি শম্ভুনাথ, তখন ওকে বাঁচাবার জন্যই ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। ভেবেছিল, আমার সামান্য ভুলের জন্য ফুলের মত মেয়েটার জীবন বরবাদ হয়ে যাবে? আর, আর প্রতিজ্ঞাও করেছিল এ পথে আর নয়। না খেয়ে মরি, সো ভি আচ্ছা, কিন্তু একাজ আর নয়।

আর চেষ্টা কি কম করেছে শম্ভুনাথ, ভাল পথে থেকে সোজাসুজি টাকা উপায়ের। হয় কই? দশ বছর ধরে তো শম্ভুনাথ লেগে আছে মানিক লালের সঙ্গে, প্রোডাকশনের সব খাটাখাটনির কাজ শম্ভুনাথই করে আসছে চিরকাল, আর প্রতিদিন আশা করছে এইবার হয়ত কিছু হবে, এই ছবিটার চার আনা অংশ মানিকলাল নিশ্চয় ওকে লিখে দেবে। কিন্তু না, হয়নি, কিছুই হয়নি। মানিকলাল চেয়ারে বসে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে উদাস সুরে বলেছে, সোব বুঝি শম্ভুবাবু, কিন্তু শেয়ার ফেয়ার চাইলে কিছু তো তোমাকেও ছাড়তে হোবে। এত ঘুরে বেড়াও, এত চিনা জানা তোমার, একটু ফিনান্স যোগাড় করতে পারবে না। বেশী লয়। লাখ দুলাখ হামি আসাই করিনা তোমার কাছে, কিন্তু বিশ পঁচিশ হাজার তো আনতে পারো।

কি করে পারবে, ভেবেই পেত না শম্ভুনাথ। কিন্তু হঠাৎ ভাগ্য খুলে গেল, আর খুলল আবার সেই পুরোণ পথেই। ভেসে গেল শম্ভুনাথের প্রতিজ্ঞা—প্রোডাকসনের জন্য, স্রেফ প্রোডাকসনের মুখ চেয়েই আবার সেই খেলাটা খেলতে হেলে শম্ভুনাথকে। কিন্তু এবার আর না বলে, না জানিয়ে নয়, আর কারুর ক্ষতিও করেনি সে।

স্বামী মারা যাবার পর সুন্দরী যুবতী মেয়ে নিয়ে প্রায় অনশনেই দিন কাটছিল সুরমা পালের। এসে কেঁদে পড়ল শম্ভুনাথের কাছে। একটা উপায় করে দাও বাবা। তুমি তো শুনি এইসব লাইনে আছ, মেয়েটাকে ঢুকিয়ে দাও সিনেমায়, যে কোন ছোট খাট পাট দিয়ে সুরু করুক জীবন।

কেন? সিনেমায় কেন? ত্যারছা চোখে মেয়ে পাপিয়ার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল শম্ভুনাথ। মেয়ের বিয়ে দেবেন না?

বিয়ে ? সুরমা পাল শাড়ীর কোণ তুলে চোখে দিলেন। বিয়ে কি করে হবে বাবা ? এক তো বাপ নেই। সহায় সম্বল, টাকা পয়সা কিছুই যে নেই। না, না শম্ভুনাথ। ওসব বলে এড়িয়ে যেওনা। মেয়েটার একটা গতি করে দাও বাবা। নাহলে না খেয়ে মরতে হবে আমাদের।

অগত্যা। কি আর করা।

সুরমা পালকে সব বলে কয়েই বাজোরিয়ার হাতে শম্ভুনাথ সমর্পণ করেছে পাপিয়া পালকে। আর খেয়ে পরে সুখেই তো আছে এখন মা আর মেয়ে। আর শুধু পাপিয়া পাল কেন, সুরমা পালেরও বিধবা অঙ্গে গয়না উঠেছে এখন, পাঠ ভাঙা গরদের কালো পাড় শাড়ী পরে তিনি এখন গাড়ী চড়ে কালীঘাটে পূজো দিতে যান।

আর এই প্রথম, একজন কেউ ফাঁকি দিলনা শম্ভুনাথকে, সত্যি সত্যি টাকা দিল। পঁচিশ হাজার টাকা। অবশ্যই টাকাটা শম্ভুনাথকে দেয়নি সে, দিয়েছে বিজনেসে। লাভ হলে ওতো পাবেই চার আনা অংশ। কিন্তু ব্যবসা বোঝে বটে। এ লাইনে ওতো একেবারে নতুন, তবু কেমন সহজেই বলল, হ্যাঁ। পাপিয়ার ছোট খাট রোল তো একটা থাকবেই, লেকিন টপষ্টারও নিতে হোবে, নাহলে ছবি বিককিরি হবে কি কোরে ?

সেলাম বাজোরিয়া, সাত সেলাম বাবা তোমাকে ? পাপিয়ার জন্য তো মনে হয় আকাশের চাঁদ চাইলেও পেড়ে আনতে পারো ? শাড়ী, গহনা জিনিষপত্র আসছে যখন তখন। হুকুম করলেই গাড়ী আসছে এখান ওখান যাবার জন্য, কিন্তু ছবির হিরোইন সে তো বক্স অফিস দেখে।

নাঃ। শিখতে হয় এদের কাছ থেকে কেমন করে কাজ করতে হয়।

শম্ভুনাথ পারত ? কই ? বার বারইতো চেষ্টা করেছে মানসীকে

হিরোইন করতে, আর বার বারই তো শম্ভুনাথের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু মানসী কি ওকে আজ এইজন্যই এত করে এখানে ডেকে এনেছে নাকি? খবর পেয়ে গেছে শম্ভুনাথ সত্যি ছবি করছে এবার।

মুস্কিল তাহলে। হিরোইন দূরে থাক, একটা ছোট খাট চরিত্রও ওকে দিতে পারবে কি সন্দেহ। কারণ কাটিং প্রায় শেষ, আর, আর মানসীকে ঠিক বাজোরিয়ার চোখের সামনে ধরতেও চায় না শম্ভুনাথ। যদিও বাজোরিয়া এখন পাপিয়ার কলতানেই মুগ্ধ, রসের ফাঁদে পা আটকান মাছির মতই মনে হয়, তবু বিশ্বাস নেই এইসব 'কাঁচাখেকো' জানোয়ারদের। নাঃ! মানিকে নিয়ে নয়, মানিকে নিয়ে আর এসব ট্রাপিজের খেলা খেলতে পারবেনা শম্ভুনাথ। খেলাই ছেড়ে দিয়েছে, আর মানিকে নিয়ে তো ভাবাই যায় না।

চমকে উঠল শম্ভুনাথ মানসীর হাতের ছোঁয়ায়। শম্ভুনাথের কাঁধের ওপর লম্বা পেলব হাত তুলে দিয়েছে মানসী, মৃদু ধাক্কা দিয়ে বলছে, একটা কোন উপায় করে দাও শম্ভুদা। দেখছোতো আর চলছে না। তোমারতো অনেক রকম জানা আছে, কোথায় যেতে পারি বলোতো?

শম্ভুনাথের মত ঝানু লোকও বুঝতে পারেনি প্রথমে, ঠিক কি বলতে চাইছে মানি। বলল, তোমার কথা তো সবাইকে বলেই রেখেছি মানি, আমাদের এই ছবিটায় ঠিক তোমার সুটেবল রোল···

না, না, না। দু'হাত তুলে হেসে শম্ভুকে থামিয়ে দিল মানসী। ফিলমের কথা বলছি না। ওতো এত চেষ্টা করেও যখন হোলনা, তখন ধরেই নিয়েছি ও আমার কপালেই নেই···

তবে? বিস্মিত শম্ভুনাথ বিস্ফারিত চোখে চেয়েছে মানসীর মুখে, আর হঠাৎই মানসীর হালকা রং করা বন্ধ ঠোঁটের না-বলা-কথার অর্থ পরিষ্কার হয়ে গেছে শম্ভুর কাছে।

হ্যাঁ! তাই। এই কথাই মানসী বলতে চাইছে শম্ভুনাথকে সুরমা পাল তার মেয়ের জন্য ইনিয়ে-বিনিয়ে ছবিতে নামানোর নাম

করে যে কথা বলেছিল, সেই কথাই মানসীও বলতে চায় মনে হয়। মানসী স্পষ্ট করেই বললো, ঢাকাঢাকি, গোপন আর করল না কিছু। বলল, দেখছোতো অবস্থা। অফিস থিয়েটারে আর পেট চলে না। এতো মেয়ে এসে গেছে লাইনে। দু'তিন মাস অন্তর দুশো কি তিনশ টাকা। তাও ঠিক নেই কিছু…

তাহলে…তাহলে…শম্ভু কি বলবে বুঝতে পারছেনা ঠিক, কোন কথাই মুখে আসছে না আর। তাহলে আর কি?

খুব জোরে হেসে উঠলো মানসী, আর শম্ভুর মনে হোল, এর চেয়ে মানসী কাঁদলোনা কেন?

মানসী হাসতে হাসতেই বলল, খুচরো কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করে দাওনা শম্ভুদা। এই একটু আধটু বেরিয়ে ঘুরে, হোটেলে খেয়ে গল্প করে যদি নগদ কিছু হয়, এই আর কি।

মানসী বলছিল, বলেই যাচ্ছিল, এসব ব্যাপারে তোমার মতন পাকা লোক আর কে আছে বল? সত্যি বলছি শম্ভুদা, এখন যদি তুমি সাহায্য না কর নিশ্চয় না খেয়ে মরতে হবে আমাদের। একটা কোন ব্যবস্থা…কোন আড্ডা…জুয়া ফুয়ার নয় অবশ্য, ওখানে আবার পুলিশ রেড করে, এমনি কোন লোক যদি চায় সন্ধ্যায় দু'তিন ঘণ্টা। এমন তো আছে অনেক।

ব্যস। ব্যস। চীৎকার করতে চেয়েছিল শম্ভুনাথ। বাঘের মত মানসীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা টিপে চিরদিনের মত ওর কথা বলা থামিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু কিছুই করেনি শম্ভু। একটা কথাও বলতে পারেনি, চেঁচায়নি, রাগ করেনি, ধিক্কারও দেয়নি মানসীকে। বারবার জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজে রাখার চেষ্টা করেছে আর নীচু হয়ে লেকের মাঠে ঘাস ছিঁড়েছে। দূর থেকে ভেসে আসা কান্নার মত, রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়া কুকুরের অন্তিম আর্তনাদের মত, কানের কাছে মানসীর হাসি বেজে উঠেছে বারবার, আর একটাই অনুনয়, একই প্রার্থনা, একটা কিছু ব্যবস্থা করে দাও শম্ভুদা।

কি হোল শম্ভুদা। কিছু বলো। মানসী আবার ঈষৎ ধাক্কা দিল শম্ভুকে। একেবারে চুপ করে গেলে যে।

জিভ দিয়ে আবার ঠোঁট ভেজাল শম্ভুনাথ। শুকনো গলায় বলল. কাল দুপুর বারোটা নাগাদ আসব আমি, তুমি রেডি থেকো।

সারারাত ঘুম হোলনা শম্ভুনাথের। এমন অভিজ্ঞতা ওর জীবনে এই প্রথম।

রাত করে বাড়ী ফেরে শম্ভুনাথ. পরের পয়সায় প্রচুর মদ্যপান করে এসে বিছানায় শোয়, মূহূর্তকাল পরেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এমন কি দৈবাৎ কোনদিন যদি সুবিধা মত মক্কেল না পাওয়া যায়, মদ্যপান নিতান্তই না হয়, সেদিন দু'একটা সিদ্ধির কুলপী খেয়ে নেয় শম্ভুনাথ, ফলে বিছানায় শুয়ে বালিশে মাথা রাখা মাত্র ঘুম, গভীর ঘুম।

কিন্তু আজ কি যে হোল। ছটফট করে বিছানায় উঠে বসল শম্ভুনাথ। হাত দিয়ে বিছানা ঝাড়ল একবার, টান করে নিল চাদরটা। শালা! ছারপোকা হয়েছে দেখছি বিছানায়। খাট থেকে নেমে ঘরের মধ্যেই এধার থেকে ওধার হাঁটল কয়েকবার, তারপর দরজা খুলে সামনের ছাদে বেরিয়ে এল।

বেশ ছিল এই এক বছর। মাণির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি, মাণির কথাও তাই আর মনে আসেনি বিশেষ। আর তার আগে, শত কাজ সহস্র ভাবনার মধ্যেও এক মানির চিন্তাই কুরে কুরে খেত ওর মাথা, ওর জীবনে ক্ষয় ধরিয়ে দিত।

কি কষ্ট, কি যন্ত্রণাই পেয়েছিল শম্ভুনাথ সেই রাতে, মিঃ ভোঁসের গাড়ীতে বসে ফেরার সময় মানসী যখন ফুলে ফুলে কেঁদেছিল, দরজা খুলে লাফিয়ে পড়তে চেয়েছিল। মানসীর সর্বনাশের জন্য নিজেকেই সেদিন দায়ী করেছিল শম্ভুনাথ আর সেইজন্যই মানসীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল তাকে সর্বনাশ থেকে বাঁচাতে, তাকে স্ত্রীর সম্মান দিতে, মর্য্যাদা বাড়াতে। ভেবেছিল যে ক্ষতি হয়েছে মানসীর তার জন্য, সে ক্ষতি-

পূরণ শম্ভুনাথই করবে, সব জ্বালা ওর মুছিয়ে দেবে। ভেবেছিল শম্ভুনাথের প্রস্তাব শুনে কৃতজ্ঞতায়, আনন্দে ছলছল করে উঠবে মানসীর মুখ, গদগদ স্বরে বলবে, শম্ভূদা। তুমি মানুষ নয়। তুমি দেবতা শম্ভুদা তুমি দেবতা। ও বাবা! কোথায় কি। কৃতজ্ঞতা, আনন্দ, লজ্জা কিছু নয়। শুধু হাসি, হো হো হাসি। হাসি থামিয়ে বলেছিল একটাই কথা, শম্ভুদা। মাথা-ফাতা খারাপ হয়ে গেল না কি? এই শুনে শম্ভুর মাথা সত্যিই খারাপ হয়ে গিয়েছিল, ইচ্ছা হয়েছিল, ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দেবে ঐ রং করা গালে। কিন্তু পারেনি কিছুই করতে শম্ভুনাথ, শুধু চুপ করে অনেকক্ষণ বসে থেকে দোকানে এক পেয়ালা চা খেয়ে উঠে এসেছে।

তারপর আর দেখা হয়নি মানসীর সঙ্গে। পরে অবশ্য জেনেছে শম্ভুনাথ, কেন মানসী শম্ভুনাথের মাথা খারাপ ভেবেছিল একটা খ্রীশ্চান ছোঁড়ার সঙ্গে তখন খুব দহরম মহরম মানসীর! গেল কোথায় এখন সে ছোঁড়া? কই! বিয়ে করতে পারলনা তাকে? কেটেছে, কোথাও থেকে শুনেছে সব, সেরেফ কেটে উঠেছে। সবাই কি আর শম্ভুনাথ যে সব জেনে শুনে, পাড়ার ছোঁড়াদের হাতে মার খেয়ে লাইফ রিস্ক করেও মানসীর কিসে ভাল হয় সম্মান বাঁচে তার চেষ্টা করবে। বিয়ে করা তো তার চাট্টিখানি কথা নয়। কত দায়, কত দায়িত্ব। আর এক বছর আগে, তখনও শম্ভুনাথের অবস্থাও এমন কিছু ভাল ছিল না, তবু সব জেনে বুঝেও অতবড় ঝুঁকিটা যে শম্ভুনাথ মাথা পেতে নিতে রাজী হয়েছিল, সে কার জন্য? মানসীর ভালর জন্যই তো? আর ফাজিল মেয়ে কিনা হো হো করে হেসেই উড়িয়ে দিল কথাটা। থাকল কোথায় এমন হাসি? ভোঁসের বাড়ী না হয় শম্ভুনাথ নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন? এখন যে নিজের ইচ্ছায় ঢুকলো গিয়ে আন্টির বাড়ী। ছি ছি ছি। শম্ভুনাথ গলা বাড়িয়ে থুঃ করে রাস্তায় থুথু ফেলল। এমন তো তুমি শম্ভুনাথকে পায়ে সাধলেও সে তোমাকে আর বিয়ে করবেনা। তোমার মনের ভেতরটা স্পষ্ট কাঁচের মতন

দেখতে পেয়েছে শম্ভুনাথ। ওঃ। খুব বেঁচে গেছে। একেবারে বাজারে গিয়ে দাঁড়ালে তুমি মানসী।

বাজারে? বাজারে? বারবার যেন নিজেকেই শোনাল, জিজ্ঞেস করল শম্ভুনাথ। বাজারে, বাজার। মানসীকে আজ দুপুরে সত্যিই বাজারে নামিয়ে দিয়ে এল শম্ভুনাথ? না, না শম্ভুনাথ কেন মানসীকে বাজারে পৌঁছে দেবে, ও তো নিজেই চেয়েছিল, বলেছিল বারবার একটা কোন ব্যবস্থা করে দাও শম্ভুদা, অবিকল সুরমা পালের কথা। তবে? মানসীই তো বলেছে, নিজেই চেয়েছে আন্টির বাড়ী যেতে। আর? মানসী যা চেয়েছে, তাই করেছে শম্ভুনাথ। হ্যাঁ! মানসী চেয়েছে বলেই···এমন চাওয়া কেন তুমি শম্ভুনাথের কাছেই চাইলে মানসী?···মাণি—মাণি···দুহাতে মুখ ঢেকে শ্যাওলা লাগা ভিজে ছাতের ওপর বসে রইল শম্ভুনাথ।

*　　*　　*　　*

যোগেন্দ্রনাথ খুশী খুশী উজ্জ্বল চোখে মেয়ের দিকে চেয়ে ঘাড় নাড়ল এই একশ পুরাই তুই দিচ্ছিস আমাকে। নারে মাণি। সবটাই শুধু আমার লাইগ্যা।

শুয়ে শুয়ে হাই তুলল মানসী, পাশ ফিরে বলল, হ্যাঁ তো। বললাম না? যাও, বড়দিনের বাজারে একটু ভালমন্দ খেয়ে এস। বাবার দিকে তেরছা চোখে চেয়ে ঠোঁট টিপে হাসল মানসী। মনে মনে বলল, খেয়ে অর্থাৎ পান করে এস। যাও, যাও, শীতের দিনে গরম হয়ে এস একটু। মানসী আজ কাল খোলাখুলিই এই রকম সব কথা বলে বাবাকে। মদ খেয়ে এস, বলেনা বটে, কিন্তু ইঙ্গিত করে সুরা পানের।

যোগেন্দ্রনাথও বোঝে, খুশীই হয়। মেয়েতো আর পোলাপান নয় এখন, সাডল্য যুবতী। বাপের সাথে বন্ধুর মত ব্যবহারইতো এমন কর্ত্তব্য। সেই বোধটা মানির আজকাল আস্তে আস্তে সহজ হচ্ছে মনে হয়। মন মেজাজও মানির এখন ভাল দেখা যায়। মধ্যে দিন কয়েক মেয়ের মেজাজ যা ছিল। বাপস্। কারখানার হেড মিস্ত্রিও এরকম হয়না। দুটো টাকা চাইলেও তখন তেড়ে আসত মেয়ে। সংসার খরচের টাকাই তখন দিতে চাইতনা মাণি, বাপের হাতে আলাদা টাকা তুলে দেবার তো প্রশ্নই ওঠে না।

মেয়ের অবস্থা এখন যে ভাল, তাতো বোঝাই যায়। কি করে ভাল? সে জানার দায় কি যোগীন্দ্রর? মেয়ের মায় যদিও প্যান-প্যান করেই যায় সবসময়, কিন্তু ওর কথায় কান দেয় কে? আর দিলে চলবেই বা কেন? এতগুলি মুখে 'অন্ন' যোগানর ভার যে

নিয়েছে সে অন্ন সে কেমন করে কোথা থেকে খুঁটে আনছে, গায়ে পড়ে সে তথ্য জানতে যাবে এতবড় আহাম্মক যোগীন্দ্রনাথ নয়।

খুশীর চোটে যোগেন্দ্রনাথ এক প্যাকেট দামী সিগারেট কিনে ফেলল। হুঃ একশ টাকা হাতে আছে না আমার? এর একটি পয়সাও সংসারে দেবে না যোগীন্দ্র। মেয়ের 'মায়ে' যতই ফ্যাচ ফ্যাচ করুক।

এখন কেবল এই এক প্যাকেট বিলাতী সিগারেট। সন্ধ্যায় তো আছেই তাজমহল। তার নতুন মেয়েটা যা নাচে না? কি যেন নাম মেয়েটার বুলবুল। আহা। বুলবুলই বটে। আসছে ও পারস্য হইতে। আহা। কোমর দুলাইয়া ঘুড়ির মত ধাক্কা মাইর্যা মাইর্যা আগায়ে যখন আসে, রক্তে এক্কেবারে আগুন লাগাইয়া দ্যায়। মা-ই-রী। আঃ। বহুদিন, বহুদিন হয়ে গেল তাজমহল যাওয়া হয়নি যোগীন্দ্রনাথের।

আজ সন্ধ্যায় একটু বিশেষ সাজগোজ করেই যেতে হবে সেখানে। কলকাতার বাবুদের মত কোঁচান ধুতি আর গিলে করা পাঞ্জাবী পরবে আজ যোগেন্দ্রনাথ। বিয়ের শাল, যেটা অনেক অভাবেও হাত ছাড়া করেনি মানসীর মা, সেই কাশমীরি শালটাই পাট করে ঝুলিয়ে দেবে বাঁ কাঁধে, আর পায়ে দেবে সেই কালো পামশু। বড় পুরাণ অবশ্য জুতো জোড়া। হোক। একটু কেড়ে-কুড়ে পালিশ-পুলিশ করে নিলেই হবে।

পালিশ আলা ডাকবে পরে, আগে নিজের হাতেই একটু নেড়ে চেড়ে দেখা যাক। ব্রাশ নিয়ে, কালি নিয়ে জুতোর সংস্কারে বসল যোগীন্দ্রনাথ। ছেঁড়া কাপড় দিয়ে সাফ করল অনেক দিনের জমা ধূলো, তারপর তাক থেকে পালিশের বক্স নামিয়ে পুরু করে ধীরে ধীরে রং লাগাল জুতো জোড়ায়।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল জুতো জোড়া। নাঃ! রংতো ভালই

লাগান হয়েছে এখন একটু রোদে থাক আধঘন্টা পর পালিশ দিলেই পুরোণ জুতো নতুনের মত ঝকঝক করবে।

জুতো হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে নামছে যোগীন্দ্রনাথ, মানসী ঢুকল খটখট হিলের শব্দ তুলে।

শীতের রোদে মেয়ের মুখ রাঙা উত্তুরের বাতাসে এলোমেলো চুল, নাকের ডগায় চিকচিকে ঘাম। দেখে দেখে যোগীন্দ্রনাথের বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। আহা। সোনার প্রতিমা মেয়েটা আমার। ভরা যুবতী। 'বিয়া' দিলে এতদিনে 'দুই ছেলের মা হইত'। ভারী একটা নিঃশ্বাস পড়ল যোগীন্দ্রনাথের। কোথায় স্বামী সন্তান নিয়ে সংসার করার কথা আজ মেয়ের—আর সে ঘুরছে টাকা টাকা করে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। বাপের সংসার রাখতে গিয়ে নিজের সংসার আর তার বাঁধা হচ্ছে না। দোষ সব তো যোগীন্দ্রনাথেরই। অক্ষম বাপ। অক্ষম স্বামী। কিন্তু যোগীন্দ্রর করার-ই বা কি ছিল? দেশ ভাগ হওয়ার পরও তো ভেঙে পড়েনি যোগীন্দ্রনাথ। ইষ্টিশানের প্ল্যাটফরমে কি রিফিউজি কলোনিতে যায়নি সে কোনওদিন। চাকরী জুটিয়ে ঘর ভাড়া নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দেই রেখেছিল সারা পরিবারকে। কপাল, মন্দ কপাল তার। চাকরী গেল, বাস থেকে পড়ে ডান হাতটা গেল জন্মের মতন। স্ত্রী পুত্র পরিবারকে ভরণ-পোষণের ক্ষমতাটুকুও রাখলে না ভগবান। আমার ফুলের মত মেয়েটা কত খেটে এর দোর তার দোর ঘুরে কে জানে কি করে দুটো টাকা আনে ঘরে, আর সেই টাকায়—

না। আর নয়। অনেক হয়েছে। কালই যোগীন্দ্রনাথ যাবে আবার হাওড়ায়। পুরাণ কাজটা যদি আবার পাওয়া যায়। গোলমাল তো মিটেই গেছে। আবার ওরা আগের মত ঘর বাঁধবে। মানসী বেণী দুলিয়ে ইস্কুল যাবে। দুর ছাই। মানসীর কি আর এখন ইস্কুল যাবার বয়স আছে। এখন মানির 'বিয়া দিতে লাগব'।

হ্যাঁ, মেয়ের এবার বিয়ে দেবে যোগেন্দ্রনাথ। বুদ্ধিমান, শিক্ষিত বড় ঘরের ভাল কোন অফিসার দেখেই মেয়ের বিয়ে দেবে যোগেন্দ্রনাথ।

আঃ। ভাবতেও কি সুখ যে লাগে। মেয়ের কাছে হাত না পেতে মেয়ের হাত ধরে তুলে দিচ্ছে আর এক হাতে—সম্প্রদান করছে তার সালংকারা সুন্দরী কন্যাকে। শাঁখ বাজছে, সানাই বাজছে, ঘটে আম্র পল্লব, আলো, লোকজন, ঝলমল করছে বাড়ী।

বাড়ী: কোন বাড়ী চোখের ভুলে ঝাপসা দৃষ্টি যোগেন্দ্রনাথ জামার খুঁটে চোখ মুছল। হায় ভগবান. বাপের হৃদয় যদি দিলে, বাপের ক্ষমতা কেন কেড়ে নিলে? কেমন এমন অক্ষম, অসহায় করে রাখলে তাকে।

বুকের কোথায় যেন একটা, ঠিক বুঝতে পারেনা যোগেন্দ্রনাথ, কি করলে, কোথায় গেলে যাবে এই কষ্টটা। তাইতো মাঝে মাঝে হাতে দু'চার টাকা এলেই আজকাল সটান 'কোহিনূর'। এক বোতল 'কালী-মার্কা' শেষ করতে কতক্ষণইবা লাগে যোগেন্দ্রনাথের, কিন্তু বুকটা ঠাণ্ডা হয়, তরল আগুন দিয়েই বুকের আগুন নিভে যায় ধীরে ধীরে।

তবে আজ আর কোহিনূর নয়, নয় 'মা কালী'। আজ একেবারে তা-জ-ম-হল। আর খাঁটি হুইস্কি। আর, আর সেই ঢলানি মেয়েটা. আঃ ভাবতেও কি আরাম। মেয়েটার মুখ মনে করতে চেষ্টা করল. নিজের মেয়ে মানসীর মুখটাই বারে বার ভেসে উঠলো চোখের সামনে. আর বুকের বাঁদিকে সেই চিনচিনে ব্যথাটা। নাঃ। আজ আর যাবেনা তাজমহলে, সন্ধ্যায় বরং যাবে দেশের বিশু উকিলের বাড়ী ভবানীপুরে। বিশু উকিল সেদিন রাস্তায় ওকে এই অবস্থায় দেখেও চিনল। গাড়ী থামিয়ে কত কথা, জিজ্ঞাসা বাদ। আবার গাড়ী ঘুরিয়ে বাড়ীর কাছে নামিয়েও দিয়ে গেল। বিশু উকিলই বলল প্রথম, মেয়ের বিয়েটা দিয়ে দাও হে! ফেলে রেখোনা, কর্ত্তব্য ওটা। আর মেয়ে তো তোমার রূপসী। আটকাবেনা। রূপোর অভাব

রূপে পুষিয়ে যাবে। ভারী ভাল কথাগুলো বলেছিল কিন্তু। আর কি সুন্দর কথা বলার ধরণ। কে বলবে মোটেই কয়েক বছর হোল এসেছে এখানে। অবশ্য লেখাপড়াটা বিশু মামার বাড়ীতে থেকে কলকাতাতেই করত। কি দু'একজন ছেলের খোঁজও যেন দিয়েছিল বিশু উকিল। যাবে, আজ সন্ধ্যাতেই যোগেন্দ্রনাথ যাবে বিশু উকিলের বাড়ী। আর সম্ভব হলে এই ফাগুনেই। মেয়ের ভাল বিয়ে হলে সেই দেখবে তখন ছোট ভাই বোনকে। আর বুড়ো বাপ মাকেই কি ফেলে দেবে। তাইতো বলে মেয়ের 'মায়'।

উত্তরের হু হু হাওয়ায় শীত শীত লাগছে এত রোদেও। আলোয়ানটা ঘরেই। বুকের ওপর দুই হাত বেঁধে উঠোন থেকে উঠে এল যোগেন্দ্রনাথ জুতা জোড়া শুকাক। বিশু উকিলের বাড়ী যেতে গেলেও একটু ভদ্দরলোক চেহারা লাগব তো।

যোগেন্দ্রনাথ ঠিক বুঝতে পারেনি প্রথমে। কি বলছে মানি? ওর সঙ্গে যেতে হবে আবার আজ রাত্রে? কেন? কি জন্য···কিছু নয়, শুধু বাপ হিসাবে সঙ্গে যাওয়া। কিন্তু যাওয়াটা কোথায়? হো-টে-লে? ওঃ। তা যোগেন্দ্র আবার কেন? হোটেলে তো মানি আজকাল একাই যায়। নতুন পার্টি।···ফিলম করবে? ফিলম পার্টি, তো শম্ভুনাথ কোথায়? সে জানেইনা। বাঃ। বেশ। রাজী হয়ে গেছে যোগেন্দ্রনাথ, আর তারপর এখন, এইত এখানে। বিরাট ঘরের এক কোণে একা একা বসে মদ খাচ্ছে যোগেন্দ্রনাথ। কোথায় মানি, আর কোথায় বা তার ফিলমের পার্টি। এসেছে অবশ্য যোগেন্দ্রনাথ মেয়ের সঙ্গেই, কিন্তু সেই যে হোটেলে দরজায় নেমেই দুজন স্যুট পরা লোকের সঙ্গে মানি আলাপ করিয়ে দিল যোগেন্দ্রনাথের, তারপর কোথায় সে? এই বিরাট ঘরে ঢুকে চেয়ার টেনে দিয়ে শুধু বলেছিল,

বোস বাবা। একটু সরে গিয়ে সেই ছুজন স্যুট পরা লোককে বলে ছিল, বাবা এইখানেই থাকবে, আপনারা শুধু বলে বসান।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আপনাকে বলতে হবেনা।

যদিও গলা নামিয়ে কথা বলছিল তারা, কিন্তু সব কথাই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল যোগেন্দ্রনাথ। লম্বামত লোকটা একজনকে ডেকে যোগেন্দ্রনাথের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে নির্দ্দেশ দিল, বাবু যো কুছ··· মানি তারপর যোগেন্দ্রনাথের কাছে এসে মাথা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল, বাবা। তুমি বোস এখানে একটু, আমি এদের সঙ্গে ওপরে যাচ্ছি, কথাবার্ত্তা বলে চলে আসব, ঘণ্টা খানেকের বেশী লাগবেনা। একটু হেসে আবার বলল, তুমি যত ইচ্ছে, যা ইচ্ছে নাওনা বিল সব পরে মিষ্টার শেঠি মিটিয়ে দেবে। বলে দিয়েছে। চোখ টিপে ঘাড়টা একটু কাত করে বলল, আরে, খাঁটি বিলিতিই খাওনা. লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন যখন।

হাসতে হাসতে সেই ছুজন 'হিন্দুস্থানী' না 'মাড়য়াড়ি' কে জানে. তাদের সঙ্গে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল মানি। আর ওরা যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল তখন স্পষ্ট দেখল যোগীন্দ্রনাথ, সেই লম্বা লোকটা তার হাত বাড়িয়ে মানির কোমর জড়িয়ে ধরল বুকের কাছে টেনে এনে জড়িয়ে ধরেই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল।

হুঁঃ। বুঝলাম। সবই বোঝে এই যোগেন্দ্রনাথ। ফিলম করবে। কচু করবে। শেষ পর্য্যন্ত টাকা উপায়ের এই পথই বেছে নিল মানি, যোগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর মেয়ে মানসী রায় চৌধুরী।

হায় ভগবান। হা ঈশ্বর—বোকা, বোকা বোকা। বোকা মেয়েটা যোগীন্দ্রনাথের। আরে পোড়া কপালি। এতদুর আসতে হোল কেন? কেন এত নীচে নামতে হোল তাকে? হ্যাঁ, তোর অক্ষম বাপটা তোকে দিয়ে টাকা রোজগার করিয়েছে বটে, ঠিকই— কিন্তু তুই? তুই করছিসটা কি? ফিলমে চান্স জুটল না কপালে, থিয়েটারও আর হচ্ছে না বুঝেছে যোগীন্দ্রনাথ কিন্তু এতদিন কলকাতা

শহরে থেকে এতটুকু সেয়ানা হলিনা তুই? শিখলিনা উরু দেখিয়ে ধান ভানার বিদ্যাটা। আবার যোগীন্দ্রকে সঙ্গে আনা হয়েছে। ভাল, তা ভাল। বাপ সঙ্গে থাকলে মেয়ের মানটা বোধহয় বাড়ে, একেবারে সস্তা হয়ে যায়না। বনেদি বোকায়। বনেদি। হাঃ হাঃ হাঃ। বনেদি বেশ্যা, বনেদি বেশ্যা।

চমকে চাইল অনেকেই। একা একা বসে এত হাসছে লোকটা। খুব খেয়েছে বুঝি? বুঁদ হয়ে গেছে একেবারে। বেশ মজা এসেছে এখন।

হাঃ হাঃ হাঃ। আরো জোরে হাসছে যোগেন্দ্রনাথ, হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, হাসছে আর হাসছে। হাসছে না কাঁদছে বুঝতে পারছেনা অনেকেই।

মৃদু নাইলনের কালো মোজা আর খাটো লাল জামা পরে গান গাইবার জন্য তৈরী হচ্ছিল যে মেয়েটি, সে কাছে এল যোগীন্দ্রনাথের, কাঁধে হাত রেখে বলল, মাই পুত্তর ডার্লিং। তারপর বুকের ভাঁজ থেকে সুগন্ধি রুমাল বার করে যোগেন্দ্রনাথের চোখ মুছিয়ে দিল, কাম, কাম ডার্লিং, কাম অন বলল বারবার, তারপর যোগেন্দ্রনাথের পাশে রাখা খালি চেয়ারটায় বসে পড়ল। হাত দিয়ে যোগীন্দ্রনাথের চিবুক তুলে ধরল শূন্যে, বল ছোঁড়ার মত করে সশব্দে চুম্বন ছুড়ে দিল সামনের দিকে। আ-ই, হায় হায় করে উঠলো কয়েকজন উল্লাসে, মেমসাহেব আরো সরে এলো যোগীন্দ্রনাথের পাশে। নিজের হাতে গ্লাস তুলে ধরলো মুখে। ঝরঝর করে আবারও দু'চোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ল যোগেন্দ্রর গ্লাসের জলে চোখের জলে এক হয়ে গেল। বুকের ব্যথাটা চলেই গেল বোধহয়, চিনচিন করছে যদিও বাঁদিকটায়, কিন্তু চলে যাবে, আর দু'এক চুমুক দিলেই চলে যাবে, জানে যোগীন্দ্রনাথ। বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিল পাশে বসা উর্বশীকে কাছে টানার জন্য, কিন্তু

ফুড়ুৎ, পালিয়েছে সে কখন। যাক! একি ঝমঝমে বাজনা, রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়। আরে, এই নাহলে জীবন?

মুহূর্তে পাত্র শেষ করছে যোগীন্দ্রনাথ, চালাও পানসী। সুন্দরী! কে তুমি? ওকি কোথায় চললে? আরে রও রও। যোগীন্দ্রকে যে সে ভাইব্যোনা। রীতিমত চৌধুরী ঘরের ছেলে। ঠাকুর্দার বাপের বজরা থাইকত ঘাটে বাঁধা। বাঈজী নাচত সেই বজরার ছাদে। ঠাকুরর্দার বাপে মুঠা মুঠা টাকা ঢালত নাচনে ওয়ালির পায়ে। জান সে খবর? দেবে, যোগীন্দ্রনাথও দেবে। সোনায় মুইড়া দেবে তোমায় ঢাহা থ্যাইক্যা আইনা দেব ট্যাহা দামের মোউরি। কে গাইত যেন অছিমুদ্দী। ঘর ছাইত, বাঁশ চাঁচত যোগীন্দ্রদের উঠোনে বসে, আর গুণগুণ করত। যুবতী! ক্যান বা কর মন ভারি। বলত খোকাবাবু! আস, তোমায় পুতুল বানায়ে দিমু।" বাঁশের টুকরো দিয়ে চমৎকার বাঁশী বানিয়ে দিত অছিমুদ্দী। যোগেন্দ্রনাথের হাতে দিয়ে বলত, আহা। যেন সাক্ষাৎ কিষ্টো ঠাকুরটি। আর বলত, খোকাবাবু বড় হলে তাকে সব শিখিয়ে দেবে। কেমন করে 'যুবতী' মেয়ের মন পেতে হয়, কেমন করে যুবতী মেয়ের ভাঙাতে হয়, কেমন করে…। কিন্তু কেমন করে বিদেশ বিভুঁয়ে যুবতী মেয়ের মান রক্ষা করতে হয়, তা কেন শেখালনা অছিমুদ্দী। অছিমুদ্দি! কোথায় গেলি চাচা, কোথায় গেল যোগেন্দ্রনাথের বাপ মা আর ঢলঢলে নদীর কাছে সুপারি গাছে ছাওয়া যোগেন্দ্রনাথের লাল টুকটুকে সেই বাড়ি। টুকটুকে বাড়িটার সাথে যোগেন্দ্রর ফুটফুটে বউটাও হারিয়ে গেল মানির মায়ের মাঝে। তারজন্যইতো যত ঝামেলা। বাপের বাড়ি থেকে গা ভরা গহনা আনেনি হারামজাদী, অঙ্গভরা রূপ এনেছিল শুধু। আর সেই রূপের ভরেইতো বিশু উকিলের বাপই ডেকে বলেছিলেন যোগীন্দ্রকে। আজ, আজ রাত্রেই বউমাকে নিয়ে বিশুদের সাথে চলে যাও। বলেছিলেন, বউমার মত রূপসী মেয়ের পক্ষে বড় ভয়ের জায়গা এখন এদেশ।

দেশ ছেড়ে রাতারাতি চলে এসেছিল যোগেন্দ্র রূপসী বউয়ের মান বাঁচাতে। বৌয়ের মানটা বাঁচল বটে, কিন্তু ওদেশ ছেড়ে এদেশে এসে যোগেন্দ্রর রূপসী মেয়ের মানটা আর বাঁচল না। কেন বাঁচল না? কেউ রাখতে দিল না রায়চৌধুরী পরিবারের সম্মান। শম্ভুনাথ? মানসী? না, না, যোগীন্দ্রনাথ, যোগীন্দ্রনাথই রক্ষা করতে পারল না মেয়ের ইজ্জত, মান সম্মান। যোগীন্দ্র···মেয়ের বাপ, মানসীর বাবা। ওঃ হো হো। চীৎকার করে কেঁদে উঠতে চাইল যোগীন্দ্রনাথ. চেঁচিয়ে বলতে চাইল সকলকে, দোষ আমার, সব দোষ আমার। কিন্তু বলতে পারল না, শব্দগুলো গলার কাছে এসে ঠেলাঠেলি করছে, যোগীন্দ্রনাথ অনেক চেষ্টা করেও তাদের বাইরে আনতে পারছে না, ব্যথা, ব্যথা সেই বুকের ব্যথাটা আবার···বাঁহাত দিয়ে চেপে ধরে বাঁদিকে বুকের ব্যথাটা সামলাতে চাইল যোগেন্দ্রনাথ, কিন্তু ব্যথাটা আরো জোর, ছড়িয়ে পড়ছে সারা বুকে, ধোঁয়া, ধোঁয়া, সব ধোঁয়া, একটু জল। যোগীন্দ্রনাথ জল চাইল হাঁ করে, কিন্তু কেউ শুনতে পেলনা ওর অন্তিম প্রার্থনা, কেউ এগিয়ে দিল না টলটলে ঠাণ্ডা জল ঝকঝকে কাঁসার ঘটিতে শুধু ছলছল নদীর জলটা দুলে উঠল চোখের সামনে, যোগীন্দ্রনাথ শব্দ করে চেয়ার থেকে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

* * * *

মাকে দেখে অবাক লাগে মানসীর। বাবা মারা যাবার পর থেকেই মার এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। এই নতুন মাকে মাঝে মাঝে চিনতে মানসীর কষ্ট হয়। এখন মা জোরে জোরে পা ফেলে হাঁটে, কপালে সিঁদুরের জ্বলজ্বলে টিপের সঙ্গে কপাল ঢাকা ঘোমটাও উধাও, উধাও মার ধীর নম্র কণ্ঠস্বর। পায়ের মত গলার স্বরেও মার জোর বেড়েছে এখন। চেয়ে চেয়ে ছাখে আর অবাক লাগে মানসীর।

এদের এই ছোট পরিবারে বাবার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা ছিল মানসীর সব চেয়ে বেশী। কথা কাটাকাটি, টাকা নিয়ে নিষ্ঠুর কঠিন আঘাত বাবাকেই করেছে মানসী, আবার বাবারই জন্য অপেক্ষা করেছে খাবার

নিয়ে, শাড়ী চাপা দিয়ে বিয়ারের বোতল মাকে লুকিয়ে এনে দিয়েছে বাবার হাতে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করেছে বসে বাবার সঙ্গে যেদিন ও বাইরে যায়নি। মার সঙ্গে খাবার সময় দেখা, ঘোমটা ঢাকা মার সুন্দর মুখের দিকে দু'একবার চোখ তুলে চাওয়া দু'একটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। কতদিনের পর দিন মার মুখটা ভাল করে দেখেওনি মানসী। কিন্তু 'মা' শব্দটার সঙ্গে কি যেন একটা জড়িয়ে ছিল যার সঙ্গে আজকের মার আর কোন মিল নেই। শুধু কি সিঁদুরের অভাব সাদা শাড়ি? (মা তো সাদা শাড়ীই বরাবর পরে, আর এখনও তো থান পরে না,) না, মানসী জানে, বুঝতে পারে শুধু এই বেশ বাস সাজ-সজ্জাই মাকে বদলে দেয়নি, মা আর সেই মা নেই অন্য মানুষ হয়ে গেছে।

জয়ন্তির বাবাও মারা গেলেন হঠাৎ ষ্ট্রোক হয়েই। খবর পেয়ে গিয়েছিল মানসী দেখা করতে। জয়ন্তীর মাও সিঁথির সরু সিন্দুর মুছে ফেলেছেন, নীল,সবুজ জর্জেট, সিফনের বদলে সুতির সাদা থান পরণে, বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে খালি কাঁদছেন, আর কাঁদছেন। তবু সেই মাসীমাকে চেনা যায়। জয়ন্তীর মার মধ্যেই নিজের পুরো মাকে যেন কিছুটা খুজে পায় মানসী, আর প্রায়ই আজকাল যখন তখন জয়ন্তীদের বাড়ী যায় মানসী।

বাবা মারা যাবার জন্য বিয়ে এক বছর পরে হবে জয়ন্তীর, সারা বাড়ীতে লোকের ছায়া, তবু ওদের বাড়ী গিয়ে বসে থাকতে ভাল লাগে মানসীর। যতক্ষণ ওখানে থাকে, ততক্ষণ মানসী ভুলে থাকে যে অর্থের জন্য তাকে আন্টির বাড়ী যেতে হয়, অচেনা, অজানা পুরুষের সঙ্গে হোটেল রেষ্টুরেন্টে গিয়ে অনেক সময় কাটাতে হয়, অনেক চিন্তা অনেক ভাবনা ভাবতে হয় বাড়ি ফিরেও।

মেসোমশাই নেই, কিন্তু জয়ন্তীর দাদা আছে, কাকারা আছেন, বাবার জন্য শোক ছাড়া অন্য কোন দুশ্চিন্তা পীড়িত করেনা জয়ন্তীকে। মুখে দুঃখের ছায়া লেগে থাকে জয়ন্তীর, বলে মা'র জন্যই ভাবনা রে।

আমার বিয়ের পর একদম একা পড়ে যাবেন। দাদার এখনোও বিয়ে হয়নি, আর সারাদিন তো বাইরে বাইরেই ঘোরে। এত সব প্রবলেম আছে জয়ন্তীর, তবু মানসী জানে মানসীর মত জয়ন্তীর কোন ভয় নেই। এখনও মানসীর ব্যাগ ভরা টাকা আছে, বুক ভরা নিশ্চিন্ত সাহস আছে। আর বাবা নাই, কিন্তু আছেন ওর মা। যে মা সিঁদুর মুছে ফেলে থান কাপড় পরেও সেই পুরোন মা'ই আছেন, বদলে যাইনি মানসীর মার মতো।

মানসীর মা আগে থাকতেন দুই ছোট ছেলে মেয়ে আর নিজের চালের হাঁড়ি আর ডালের কৌটো, গুঁড়ো কয়লার গুল দেওয়া নিয়ে উঠনে কার কতটা অধিকার আর রেশনের চিনির বাড়া কমা নিয়ে। মানসী কি করে, কখন ফেরে কি সাজ পোশাক করে এ নিয়ে মার বিশেষ কোন কৌতূহল লক্ষ্য করেনি মানসী।

আজকাল, সন্ধ্যার দিকে মানসী সাজ-পোশাক শুরু করলেই মা নানা ছুতোয় ঘরে আসে, চেয়ে চেয়ে ছ্যাখে মানসী কেমন করে ঠোঁট রাঙ্গাচ্ছে, কোন শাড়ী বার করছে বালিশের তলা থেকে। গালে রং লাগাতে ভুলে গেলে পাশ থেকে মা হঠাৎ বলে ওঠে, রুজ মাখলিনা খুকী! কিংবা বলে, চোখের পাতায় কাজল দেওয়ন আইজ অত বালা হয় নাই তো। বলে, আর একখান প্রলেপ দিতে লাইগবো।

মানসী মার মন্তব্যের কোনও উত্তর দেবার চেষ্টা করেনা, শুধু অবাক হয়ে চুপ করে শোনে মার কথা, আর লক্ষ্য করে, মানসীর সাজ যত শেষ হয়ে আসছে, মা ততই কেমন চঞ্চল অস্থির হয়ে উঠছে

কপালে কুমকুমের টিপ আঁকতে আঁকতে মার চোখও দপদপ করে জ্বলে ওঠে, মা আঁচলে বারবার মুখ মোছে, ফরসা মুখ বারবার লাল হয়ে যায়। অবাক চোখে ফিরে ফিরে মাকে দেখে মানসী।

আর যত রাত্রেই ফিরুক, যত নিঃশব্দেই চাবী ঘুরিয়ে ঘরে ঢুকুক মানসী, মা ঠিক জেগে যায়, ঘুম ভাঙ্গা ফোলা ফোলা চোখে সামনে

এসে দাঁড়ায়, একটু হেসে প্রশ্ন করে, কি ? আজও রিহার্সালই ছিল খুকী ?

মানসী কথা বলেনা, ঘাড় হেলিয়ে নিঃশব্দে জুতো খোলে, শাড়ী খোলে, মুখ ধোয় ঘরের কোণে। মা আরও একটু দাঁড়ায়, সামান্য শব্দ করে হাসবার চেষ্টা করে, কখনও বলে, কিছু লাইগব্যো, জল দিমু ? মানসী আস্তে না বলে, মাথা নাড়ে, মা জোর শব্দ করে দরজা বন্ধ করে করে ভেতরের ঘরে চলে যায়, মানসী এসে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে।

এমনি করেই চলছে আজ এক বছর। কিন্তু মনে হচ্ছে আর বুঝি চলবেনা, আর চালাতে পারবেনা মানসী।

এই দীর্ঘ এক বছরে মাত্র তিনটি অফিস ক্লাবের অভিনয় করে সাতশো টাকা পেয়েছিল মানসী। কাজটা যোগাড় করে এনেছিল শম্ভুদাই! শম্ভুদার ঋণ এ জীবনে শোধ হবার নয়। মনে মনে বলে মানসী। পাড়ার ছেলেরা শম্ভুদার মাথা কামিয়ে দিয়েছিল মেয়ের দালালি করে বলে, বাবাও আজকাল বিরক্ত হোত কতবার শম্ভুদার ওপর, আর মানসী নিজেও তো লিকলিকে ঘাড়, জিরজিরে চেহারা শম্ভুদাকে মানসীদের সারা পরিবারের এক বিশ্বস্ত সেবকের বেশী কিছু ভাবতে পারেনি। জয়ন্তী যখন জিজ্ঞেস করেছিল, ঐ লম্বা রোগা লোকটা কে রে ? তোর সঙ্গে ঘোরে দেখি প্রায়ই, তোর বয় ফ্রেণ্ড।

দূর। কি যে বলিস ?

তবে ?

ঐ আছে আর কি ? অনেকদিনের চেনা, মার ফাই ফরমাস খাটে, আমায় ট্যাকসি ধরে দেয়, মা ওকে সঙ্গে যেতে বলে কখনও সন্ধ্যায় রিহার্সাল থাকলে।

তোর খুব অনুগত মনে হয় কিন্তু···প্রেমে পড়েছে বোধহয় তোর। বিয়ে করে নেনা ওকে।

ভাগ। বাড়ির পুরোণ চাকরকেও তাহলে বিয়ে করতে হয়।

বলেই অবশ্য মনে মনে জিভ কেটেছে মানসী। না, না, শম্ভুদার সম্বন্ধে এরকম বলা অন্যায়। আর শম্ভুদাকে ঠিক ওরকম ভাবেও না মানসী। দাদা দাদা, ভাই ভাই।

ভৃত্য নয় নিশ্চয়ই, তবে শম্ভুদাকে স্বামী রূপে কল্পনাও করতে পারে না মানসী। আর নিয়তির কি পরিহাস! সেই শম্ভুদার স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েই চিকিৎসা করাতে হোল ওকে, প্রাণ বাঁচল, বাঁচল ইজ্জত। মানসী বুঝতে পারেনি প্রথমে, এই জ্বালা, এই কষ্ট কেন? ক্রমশঃ বেড়েছে যন্ত্রণা, অন্য নানা লক্ষণ দেখা দিয়েছে, আর কড়াৎ বাজ পড়েছে মনের মধ্যে। আন্টির বাড়ির কমলার এই অসুখ হয়েছিল। কমলা একদিন নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিল মানসীকে। সরু গলির মধ্যে ছোট দু'খানা ঘর, স্বামী কেরাণী। অবাক হয়ে গিয়েছিল মানসী। সে কি? তোমার স্বামী আছেন, চাকরী করেন, তবুও তুমি···তুমি।

আন্টির বাড়ী যাই, এইত।

হ্যাঁ, মানে কেন? তোমার স্বামী এ্যালাউ করেন কি ভাবে।

এ্যালাউ করবে কি! ও জানেই না।

সে কি!

হ্যাঁ। আন্টির বাড়ী তো দুপুরে। আর ছুটির দিন তো আমি যাই না, আর রোজ ও নয়।

কিন্তু, কিন্তু কেন?

কেন আবার, পয়সার জন্য।

দুটো বেশী পয়সার জন্য···

হ্যাঁ। দুটো বেশী পয়সার জন্য যদি আমার স্বামী রেস খেলতে পারে, জুয়ার আড্ডায় যাবার জন্য তিনদিন লক আপে থাকে, আমিই বা তাহলে দুপুরে দু'তিন ঘণ্টা আন্টির বাড়ি বসে পয়সা রোজগার কোরবোনা কেন?

মানসী অবাক চোখে তাকিয়েছিল কমলার দিকে, ঠিক যেন বুঝতে

পারছিল না, আর জলভরা চোখে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চিপে চিপে অনেক কথাই তখন বলছিল কমলা।

বলেছিল, ভালবেসে ঝুলে পড়তে পড়তেই রূপবাণ রনজিৎ বোসকে বিয়ে করেছিল কমলা চট্টোপাধ্যায়, অসবর্ণ বিবাহে প্রথমে মত দেননি বাবা। কিন্তু রনজিতের মনোহর কান্তি, মধুর আলাপ আর সর্বোপরি সায়েব কোম্পানীর বড় অফিসারের পদ মর্য্যাদায় আপত্তি ভুলেছিলেন বাবা। কমলাদের অবস্থায় যতটা সম্ভব, ততটাই ঘটা করে বিয়ে হয়েছিল, বিয়ের পরে তারা কমলার বাবার দেওয়া আসবাব পত্র, গহনা বাসন নিয়ে উঠে এসেছিল বালিগঞ্জের ছোট ছিমছাম এক ফ্ল্যাটে। উত্তর কলকাতা থেকে ছোট ভাই বেড়াতে আসত, বোন আসত, কিন্তু রনজিৎদার দেখা পেতনা তারা। কোথায় রনজিৎদা

ওভারটাইম।

দূর। অফিসাররা আবার ওভারটাইম করে নাকি? তুই জানিস না। মিটিং-ফিটিং নিশ্চয়।

তা হবে।

রোজই ফিরতে রাত হোত রণজিতের, অনেক বলে অনুনয়, অভিযোগেও ফল হয়নি কিছু। এক শনিবার একেবারে রাত শেষ করে ফিরল রণজিৎ, টলমল পা, এলোমেলো চুল। উদভ্রান্ত বিপর্য্যস্ত রণজিৎ এসে বিছানার ওপর ভেঙ্গে পড়ল। হু হু কান্না আর থামতেই চায় না। স্বামী মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বাড়ী ফিরেছে, কাঁদবার কথা তো কমলার, রণজিৎ কেন এরকম করছে।

কাঁদতে কাঁদতে নেশার ঝোঁকে সব কথা খুলে বলল রণজিৎ। মিথ্যা কথা বলে কমলাকে বিয়ে করেছে সে, অফিসার সে নয়, সাতশো টাকা মাইনেও পায়না কেরাণী, তিনশ টাকা মাইনে।

—আমাকে যে প্রতি মাসে মাইনের সাতশো টাকা এনে দাও।

সেইতো, সেইতো। তখনও চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল রণজিতের, প্রতি সন্ধ্যায় তিন পাত্তি খেলি, শনিবার রেশ, চারশো টাকা যেমন

করে পারি, যোগাড় করি, আর, আর পারছিনা, এই রেসটায় সর্বশান্ত হয়ে গেছি আজ। ওঃ হো, আর্তনাদ করে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়েছে রণজিৎ, আর শুষ্ক, কঠিন চোখ করে দাঁড়িয়ে কমলা ভাবছে আর ভাবছে।

পরদিন যখন রণজিৎ একটু সুস্থ, নেশার ঘোর যখন মুছে গেছে যখন ও একটু লজ্জিত, ভাবছে কি কৈফিয়ৎ দেবে কমলাকে তখন কমলাই সান্ত্বনা দিয়েছে ওকে। বলেছে ভেবনা কিছু। ধাক্কা দাওনি তুমি আমাকে এরকম অনেক লোকই করে, নভেল থেকে পড়া কথাটা শুনিয়েছে ওকে, নাথিং রং ইন লভ এ্যাণ্ড ওয়ার। কিন্তু মান রাখার জন্য এমন করে আর জীবন পোড়াতে হবেনা রণজিতকে। কমলাও চাকরী করবে, ছোট খাট যে কোন, কতরকম কাজ করে আজকাল মেয়েরা। কিছু টাকা ঘরে ও আনবেই।

তারপর চাকরীর জন্য দিনের পর দিন কোথায় না গেছে, কাকে না ধরেছে কমলা। যে কোন খাটুনি, যে কোন মাইনেই রাজী ছিল ও। হয়নি, কিছুই হয়নি, একটা বিজ্ঞাপনের মডলিং-এর কাজ পর্য্যন্ত মেটাতে পারেনি ও। অবশেষে কোথা থেকে কেমন করে যেন ঐ আণ্টির বাড়ী।

কিন্তু...

জানি, অনেক কিন্তু, অনেক কেন? কিন্তুটা কি জান মানসী।

কি।

প্রতিশোধ।

প্রতিশোধ!

হ্যাঁ। ও যে আময় ঠকিয়েছিল, মিথ্যা বলত সেই জ্বালা ছিল আমার বুকে...

আশ্চর্য্য। সত্যিই অবাক হয়েছিল মানসী, একি অদ্ভুত উপায় প্রতিশোধ নেবার।

হ্যাঁ, কিন্তু শেষ অবধি হেরে গেলাম, মানসী হেরে গেলাম আমি।

হেরে গেলে।

হ্যাঁ। সব খুলে বলতে হোল ওকে।

ইস। ছোট একটা আর্ত্তনাদ বেরিয়ে এল মানসীর গলা দিয়ে।

বলতেই হোল, কারণ আমার লোভের জন্য, একদিনের ভুলের জন্য খারাপ রোগে ধরল।

বল কি? মানসী রুদ্ধ শ্বাস

হ্যাঁ। সব খুলে বললাম ওকে, বললাম ওর ওপর প্রতিশোধ নিতে, টাকা রোজকার করতে যে আমিও পারি দেখিয়ে দিতে আন্টির বাড়ী যেতাম। বললাম, তুমি এখন ত্যাগ কর আমাকে, ডিভোর্স নাও, আমি নিঃশব্দে চলে যাব।

তুমি চলে এসেছ নাকি এখন।

না, না, না। মধুর করে হাসল কমলা। ও বড় ভাল লোক রে। বড় মহৎ, উদার। বলল, দোষ তো আমারই। আমিই তোমায় প্রথম মিথ্যাচার শিখিয়েছি। ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করাল আমার। তারপর আমরা জিনিষ পত্র বেচে সব দেনা শোধ করে এই ছোট ঘরটায় উঠে এসেছি এইত মোটে দু'সপ্তাহ। তুমিই প্রথম বাইরের লোক যে এল এই বাড়ীতে।

তবে তুমি আবার আজ আন্টির বাড়ী গেলে কেন?

আন্টির কাছে কিছু টাকা ধার করেছিলাম, সেটা শোধ দিয়ে এলাম।

মানসীর সময় লাগছিল কমলার কাহিনী আত্মস্থ করতে। কমলা দু'পেয়ালা চা নিয়ে এল রান্না ঘর থেকে। আবার বলল, বেশ লাগছে ভাই এখন এই সামান্য ভাবে থাকতে। নতুন জীবন পেয়েছি আমরা বিয়ের দু'বছর পর। বড় সুখে আছি আমরা মানসী এখন। বড় সুখে আছি।

বেশ কয়েকদিন কথাগুলো মানসীর কানে ভেসেছে বড় সুখে আছি এখন, বড় সুখে আছি।

এই রকম সামান্য অবস্থায় বড় সুখে থাকতে তো মানসীও চায়, কিন্তু পারে কই! কোথায় তুমি এ্যালবার্ট। কতদূর? তোমার চওড়া বুকে মাথা রেখে কাঁদতে বড় যে সাধ মানসীর। কিন্তু জ্বালা, জ্বালা, এই যন্ত্রণার হাত থেকে তো অবিলম্বে মুক্তি পেতে হবে: স্বামী নেই তার কমলার মত, এ্যালবার্ট থাকলে কি বলত তাও জানা নেই মানসীর, বাবা পর্য্যন্ত নেই আজ পাশে। একমাত্র শম্ভুদাকেই মনে পড়ল মানসীর, আর ডাকা মাত্রই বহুদিন পরে আবার এল শম্ভুনাথ।

বেশী বলতে হোলনা শম্ভুনাথকে। দু'একজন ডাক্তারের নাম ধাম জিজ্ঞাসা করতেই শম্ভুনাথ বলল, মানি, লুকিয়োনা আমার কাছে। বিপদে পড়েছ, তাই না।

কি বলবে মানসী, মাটির দিকে চেয়ে বসে রইল নিথর হয়ে

শম্ভুনাথ অস্থির পয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারী করল কয়েকবার, আঙ্গুল দিয়ে নিজের কপাল টিপে ধরে বাবার টিনের চেয়ারটায় বসে পড়ল শব্দ করে। তারপর বলল, আমারই দোষ। সম্পূর্ণ দোষ আমারই। তুমি ছেলেমানুষ, অভাবের জ্বালায় যাই বলে থাক,...উচিত হয়নি আমার ওখানে নিয়ে যাওয়া। ছটফট করেছে শম্ভুদা, আর বারবার বলেছে ঐ এক কথাই। আমারই দোষ, সম্পূর্ণ দোষ আমারই, কারুর নয়, আমার দোষ।

কমলার স্বামীর মতো বলছে শম্ভুদা, মনে হয়েছে মানসীর। হেসে ফেলেছে ও, হঠাৎই বলেছে আচ্ছা নাহয় দোষ তোমারই, কিন্তু এখন এর থেকে কি আমার কোন উদ্ধার নেই? উদ্ধারের উপায়। খুব ধীর স্বরে বলেছে শম্ভুনাথ, যেন নিজেকেই জিজ্ঞাসা করেছে: তারপর ধীরে ধীরে প্রত্যেকটি শব্দ যেন খুঁজে খুঁজে বের করে এনে বলেছে, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে, ভেবনা।

পরদিনই এসেছে শম্ভুনাথ। চলো।

কোথায়?

ডাক্তারের কাছে।

শম্ভুদা, সব জানাজানি হয়ে গেলে তো—

কোন ভয় নেই, ডাক্তাররা এসব গোপন রাখেন, তাছাড়া তোমার আসল নাম তো সেখানে বলা হবে না।

তবে ?

তোমার অন্য নাম। তুমি এখন আমার বউ প্রীতিলতা দাস। বলেই ট্যাকসির জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছে, মানসীর দিকে ফিরে কথা বলেছে ডাক্তারের বাড়ির সামনে গাড়ী থামিয়ে। এস নেমে এস।

মানসী নিঃশব্দে শম্ভুনাথের সঙ্গে এসে ঢুকেছে ! ডাঃ স্যানিয়ালের চেম্বারে। আর অবাক হয়ে দেখেছে সপ্রতিভ শম্ভুনাথ কেমন অনায়াস স্বচ্ছন্দে ডাঃ স্যানিয়ালকে মানসীর অসুখের কাল্পনিক উৎসের সন্ধান দিচ্ছে। বলছে দোষ শম্ভুনাথেরই, ট্যুরে গিয়ে এক সপ্তাহের অসংযমের ফলে এই রোগ বহন করে এনেছে ও, বুঝতে না পেরে আবার এই রোগ সঞ্চারিত করেছে স্ত্রী প্রীতিলতা দাসের শরীরে। কাজের জন্য আবার গেছে অন্য শহরে, নিজের চিকিৎসা সেখানেই করিয়ে এসেছে, এখন ও নিজে সম্পূর্ণ সুস্থ, কিন্তু বেচারা বউটা তার ; বিনা অপরাধে কি প্রচণ্ড শাস্তি পাচ্ছে।

ডাঃ স্যানিয়াল গম্ভীর মুখে শুনছিলেন। বললেন তবু ভাল, আপনি নিজের মুখে স্বীকার করলেন, ভয় নেই সেরে যাবে। আসুন মিসেস দাস, পাশের ঘরে যেতে হবে।

মিসেস দাস ? হঠাৎ বুঝতে অসুবিধা হয়েছে মানসীর, শম্ভুনাথ এক হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ওর পিঠে, এস প্রীতি, ওঘরে যেতে হবে।

অবাক হয়েছে মানসী শম্ভুদার অভিনয় ক্ষমতা দেখে, শম্ভুদা একে ওকে সিনেমায় নামাবার চেষ্টা না করে নিজে সিনেমায় নামে না কেন ?

সে অভিনয়ের পালাও শেষ হয়েছে একদিন, যদিও প্রতিমাসেই শম্ভুদার সঙ্গে গিয়ে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে আসে মানসী।

এদিকে বসে বসে খেয়ে টাকা তো কবেই শেষ। শম্ভুদা যা কুড়ি,

ত্রিশ, দশ যখন যা পাবে দেয়, আর মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপনের মডেলিং ইত্যাদিতে কচ্চিৎ দেড়শো, দুশো টাকা।

তাতে কি হয়? চলে তাতে?

কিন্তু শম্ভুদা আর কিছুতেই মানসীকে যেতে দেবেনা আন্টির বাড়ী, বলে আর নয়, ঢের হয়েছে। কিন্তু ঢের হয়েছে ভেবে বসে থাকলে মানসীর চলে কই? মানসীর মা সে কথা বোঝে কই? আর, একটা কথা, যেটা মানসী বোঝাতে পারবেনা, কাউকেই বোধহয় বোঝান যাবেনা যে আন্টির বাড়ী যাওয়া, না যাওয়া, এই শরীরটার ওপর নির্যাতন কিছুই আর ছুঁতে পারে না মানসীকে। কাকে রক্ষা করবে মানসী, কাকে বাঁচাবে? জয়ন্তী সেদিনকে এক কবির কবিতা পড়ে শুনিয়েছিল মানসীকে একটা লাইন ভারী ভাল লেগেছিল মানসীর, বড় মিলে যায় মানসীর জীবনে 'ব্যবহৃত, ব্যবহৃত, ব্যবহৃত হয়ে শূকরের মাংস হয়ে গেছে।' মানসীও কি আর মানসী আছে? বহু ব্যবহৃত মানসী ও সেই শূকরের মাংসই কি হয়ে যায়নি? চোখ দিয়ে হঠাৎ কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। আয়নার নিজের দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল মানসী, ছি মানসী ছি! নিজেকে শূকরের মাংস ভাবতে এখনও কষ্ট হয় তোমার? আমি তো চাইনি, আমি তো চাইনি। রোজ। চোখের ফাঁকে অবিরল জল গড়িয়ে পড়ে, মানসী শব্দ না করে কাঁদে অনেকক্ষণ কাঁদে। অনেক কেঁদে হালকা হয় বুকটা। কোণের কুঁজো থেকে জল নিয়ে মুখ ধোয়, চিরুণি দিয়ে চুলটা ঠিক করে, হালকা লিপষ্টিক বোলায় ঠোঁটে, তারপর চোখে গোল রোদ চশমা পরে বেরিয়ে পড়ে।

হেঁটে হেঁটে জয়ন্তীর বাড়ী পৌঁছে লিফটে চড়ে সোজা সাততলা।

আরে তুই! আয় আয়। কোলাহল করে অভ্যর্থনা করে জয়ন্তী।

ডিসটার্ব করলাম নাতো? কি করছিলি।

ডিসটার্ব? জয়ন্তী ভুরু কুঞ্চিত করল। খুব ওস্তাদি কথা,

শিখেছিস তো ? করব আবার কি ? শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলাম, আয় বোস।

না বোসবোনা। বিনা ভূমিকায় মানসী বললো আমাকে শ'তুই টাকা ধার দিতে পারিস ! ধার বলছি যদিও, তবে কবে ফেরত দিতে পারব কিছু ঠিক নেই কিন্তু।

জয়ন্তী অবাক হোলনা, কোন প্রশ্নও করলোনা। শুধু বলল দাঁড়া, চাবী ঘুরিয়ে আলমারী খুলল, ড্রয়ার টেনে বার করলো তুটো বড় নোট বলল, ধর।

মানসী ধরল, ধরে দাঁড়িয়েই থাকল অনেকক্ষণ। কি আশ্চর্য ! ও তো জানতো, ও তো জেনেই এসেছিল যে টাকাটা পাওয়া যাবে। জয়ন্তীর বাবা মারা গেলেও ওদের আর্থিক অবস্থার তারতম্য ঘটেনি বিন্দুমাত্র। বাবার ব্যবসা দাদা দেখে, আর বাড়ির একমাত্র মেয়ে জয়ন্তীর অর্থ সম্বন্ধে অগাধ স্বাধীনতা, টাকার থলি ওর ভরাই থাকে সেই ছোটবেলা থেকেই। ইস। আরো একটু বেশী চাইলেই হতো, একেবারে পাঁ-ছ-শো। কি বোকা মানসী। না, না, ছি ছি। এত ছোট হয়ে যাচ্ছে নাকি মানসী। নামছে এত নীচে ! তুশো টাকার মতই দরকার, মাকে দিতে হবে সংসার খরচ ? অনায়াসেই টাকাটা পাওয়া গেল বলেই মানসীর লোভ বাড়ল নাকি ? ছি ছি।

কি হোল রে। বোস। মানসীর দিকে না ফিরেই আলমারী বন্ধ করতে করতে জয়ন্তী বলল, দাঁড়া চা বলে আসি।

না না, চা খাব না।

ও, তোর আবার ঠাণ্ডা ভাল লাগে। ঘোলের সরবৎ।

হঠাৎ সহজ হোল মানসী, ঘোলতো খাচ্ছিই সারা জীবন, তুই ঘোল খাওয়াবি।

গলা ছেড়ে হেসে উঠল জয়ন্তী, মানসীও হাসল, অনেক হালকা লাগছে এখন মানসীর একটু আগেই কি এক দম বন্ধ করা পাপ বোধ পীড়িত করছিল মানসীকে। জয়ন্তীদের ঈষৎ হলুদ চওড়া দেয়ালে

হঠাৎ যেন ভেসে উঠেছিল এ্যালবার্টের মুখ, যেন কি বলছিল এ্যালবার্ট। তুমি এসবের মধ্যে থেকনা মানসী, তুমি ভোরের ফুল।

অনেকদিন বাদে কথাটা আবার রিনরিন করল কানে, তুমি ভোরের ফুল।

কি রে। মৃত্যু ধাক্কা দিল জয়ন্তী মানসীকে, কি ঘোল না খেলি, কি নিবি বলবি তো, লেমন? না অরেঞ্জ।

কিছু না। আমায় এক্ষুনি যেতে হবে রে।

তোরতো সব সময়ই তাড়া। কি যে এত রাজকার্য্য করিস।

সত্যি। মানসী অল্প হাসল। রাজকার্য্যই বটে। চলি! মানসী পা বাড়াল। এই শোন! জয়ন্তী টানল মানসীর হাত ধরে। বিয়ে করবি।

সব সময় ফাজলামী তোর। হাত ছাড়। আমার সত্যিই তাড়া আছে।

না রে সত্যি, ফাজলেমী নয়। দাদার সেই যে বন্ধু আছে না ইন্দ্রনীল ব্যানার্জি, তুই তো কতদিন দেখেছিস তাকে, বেশ ভালো দেখতে তো, কি হোল।

বড় চাকরীও করে। ভীষণ পছন্দ তার তোকে হ্যাঁরে। বলেছে আমাকে, তোকে ইন্দ্রনীলদা বিয়ে করতে চায়।

ভাগ। হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছে মানসী। আর বাড়ী এসেও বুক ঢিপঢিপ কান গরম। বিয়ে করতে চায়, বিয়ে। আহা কি মধুর এই তিন অক্ষরের শব্দ, বি-বা-হ। লাল টুকটুকে একটা বেনারসী পরার সখ মানসীর অনেক দিনের। জর্জেট নয়, সিফন নয়, নাইলন টেরিলিন কিছু নয়, বেনারসী। শুধু একটি লাল টুকটুকে বেনারসী পরে পিঁড়িতে বসে ঘোর সাতবার, সমস্ত জীবনটাই তারপর বদলে যাবে। করবে নাকি মানসী বিয়ে সেই ইন্দ্রনীলকে? দেখেছে ভদ্রলোককে বার কয়েক জয়ন্তীদের ফ্ল্যাটে, সামান্য কিছু কথা হয়েছে দু'চারবার, কিন্তু বিয়ে? বিয়ে মানে কি শুধুই নিরাপত্তা আর

নিশ্চিন্ত আরাম? বিয়ে মানে যে আরো অনেক কিছু। এ্যালবার্ট! কেন তোমার মুখটা বারবার ভেসে উঠছে চোখের সামনে 'বিয়ে' শব্দটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে। কেন? কেন? কেন? তুমিই প্রথম ব্যক্তি যে চেয়েছিল মামসীকে বিয়ে করতে, তাই। কিন্তু তোমায় বিয়ে করলে তো লাল বেনারসী পরা হোতনা। পরতে হোত সাদা। তাই না। ধ্যাৎ! এ্যালবার্ট হেসেছিল। আমরা কি ছাই গিয়ে বিয়ে করব নাকি? ওসবে আমি বিশ্বাস করি না। আমাদের হবে রেজিসট্রি ম্যারেজ। লাল, সবুজ যা খুশী, কালো পরলেও ক্ষতি নেই। তোমাকে সব শাড়িই সুন্দর দেখাবে।

যাঃ। কালো আবার কেউ বিয়েতে পরে নাকি? আমার লালই ভালো লাগে।

যা খুশী তোমার···

ইন্দ্রনীলকে বিয়ে করলে অবশ্য লাল বেনারসী পরার কোন অসুবিধাই হবেনা, পিঁড়িতে বসে সাত পাক ঘোরাও যাবে। ভাবতে চেষ্টা করল মানসী ছবিটা, পিড়িতে বসে মুখে ঢাকা দিয়ে সাত পাক ঘুরছে সে, আর টোপর মাথায় হাসি হাসি মুখে সামনে দাঁড়িয়ে কে? না, না, না। ইন্দ্রনীল নয়, ইন্দ্রনীল নয়, হতে পারেনা। এ্যালবার্ট ছাড়া আর কেই নয়, কেউ নয়। এ্যালবার্ট। এ্যালবার্ট। কোথায় তুমি কতদূর? এস এস। অনেক দিন যে হোল। আর যে পারেনা মানসী। কি পারেনা? এই ভাবে প্রতীক্ষায় দিন কাটাতে। কিন্তু এ্যালবার্টের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার অধিকারটুকুও তো সে নিজেই নষ্ট করেছে। যে মানসীকে এ্যালবার্ট রেখে গিয়েছে সেই মানসী কোথায়? এ্যালবার্টের মত জালে তো সেও জড়িয়ে গেছে। শুধু তফাৎ এইমাত্র যে এ্যালবার্ট না জেনে, আর মানসী সমস্ত জেনে শুনে স্বেচ্ছায় ফাঁদে পা দিয়েছে। ধরা পড়ার জন্যই ধরা দিয়েছে। না, মানসীকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না, এ্যালবার্ট নয়, ইন্দ্রনীল নয়, কেউ নয়। না, না, হঠাৎ মনে পড়ে গেল মানসীর, একজন কেবল

মাত্র একজনই, পারত বাঁচাতে। মানসীর জীবনের গোপন পাপ, বিপুল পরাজয় সবই যার জানা। সেই একমাত্র শম্ভুদাই হয়ত বাঁচাতে পারত মানসীকে, আর বাঁচাবার জন্য এগিয়েও এসেছিল আবার। চিকিৎসা শেষ হবার পরে রুটিন মাফিক পরীক্ষার জন্য রক্ত দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল ওরা. পাশাপাশি। হঠাৎ শম্ভুদা গাঢ় স্বরে বলল, মানসী।

শম্ভুদার গলার আওয়াজ প্রথমে চিনতে পারে নি মানসী। কে ডাকল, কে ডাকল এমন করে মানসী বলে। শম্ভুদা তো মানি বলে। আবার শুনল কাণের কাছে সেই মৃদু গাঢ় স্বর মানসী।

কি, কি কি বলছ।

মানসী বলছিলাম কি···মানে···বার দুই গলা ঝাড়ল শম্ভুনাথ, বলছিলাম মনে···এরম করে তুমি আর কতদিন চালাবে? কাকাবাবুও নেই, মানে—হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে বলে ফেলল, এস। আমরা বিয়ে করি।

বিয়ে করি মানসী যেন বুঝতে পারছেনা ঠিক বুঝতে পারছে না। বলল, মানে···

মানে, এই আর কি? আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে।

আমার সঙ্গে বিয়ে। সেবারের মত আজ আর হো হো করে হাসলনা মানসী, গলার কাছে কষ্টের, যন্ত্রণার পিণ্ডটাকে ঠেলে নীচে নামাতে চাইল, চাইল সামনে দাঁড়ান এ্যালবার্টের লম্বা মূর্তিটাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে, চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। একটু সময় নিয়ে ধীরে ধীরে বিষন্ন মাথা নাড়ল মানসী, সে হয়না ভাই শম্ভুদা। আমি তোমায় দাদার মতই দেখি সে সত্যিই হয়না।

দাদার মত দেখ। ওঃ। আচ্ছা। সারা রাস্তা আর কোনও কথা বলেনি শম্ভুনাথ, আর মানসীর চোখ দিয়ে বারে বারেই জল গড়িয়ে পড়েছে। বিয়ে শব্দটার সঙ্গে কি যে আছে এ্যালবার্টের

ছবিটা বড় বেশী সামনে এসে দাঁড়ায়, আর চোখের জলে মানসীর মুখ ভেসে যায়।

আজও করকর করে জল কাটল মানসীর চোখ দিয়ে, আর বারবার মানসী আহ্বান জানাল এস ওগো এস। কে আসবে? এ্যালবার্ট? নাকি না দেখা না জানা কোন পরম বন্ধু, কে সে, জানেনা, মানসী জানেনা, শুধু নদীর স্রোতের মতো গানের সুরের মত, অগীত প্রার্থনার ধারা বয়ে চলল মানসীর প্রাণে, মনে। এস হে এস প্রাণে প্রাণসখা এস, এস, এস।

মানসী কেরোসিন কুপির সামনে বসে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল চিঠিটা আজকাল আবার এ নতুন ঢং শিখেছে কলকতা শহর, বলা নেই, কওয়া নেই, দপ করে আলো নিভে গেল। আজও আলো জ্বলেনি সন্ধা থেকেই, আর চিঠিটা যদিও সকালের ডাকেই এসেছে, কিন্তু মা দিল এখনই। বেশ বড় সড় খাম। লাল কাগজে সোনালি অক্ষরে লেখা, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান শম্ভুনাথের সহিত ইত্যাদি, ইত্যাদি। শম্ভুদার সত্যিই বিয়ে হচ্ছে তাহলে। আর মা বলছে খুব নাকি ভাল বিয়ে হচ্ছে শম্ভুর হ্যাঁ। ভাল বিয়ে তো হবেই, হওয়াই উচিত, এখন রীতিমত পয়সা করেছে সে। পর পর তিনখানা হিট্ ছবির চারআনার অংশীদার সে। মা বলে লাখ লাখ টাকা হয়েছে শম্ভুর।

লাখ লাখ টাকা শম্ভুদার হয়েছে কিনা সঠিক জানেনা মানসী, তবে সে শম্ভুদা আর নেই। নতুন এই শম্ভুদার মধ্যে পুরোণ সেই শম্ভুদাকে খুঁজে পাওয়াই ভার। কিছুদিন ধরেই শম্ভুদা ধুতি, সার্ট ছেড়ে প্যাণ্ট সার্ট পরেছে বটে, জামা কাপড়ের জাত এখন রীতিমত উঁচু মানের। চৌরঙ্গী পাড়ার বড় দোকান থেকে মাপ দিয়ে করান। ভবানীপুরের দোকান থেকে 'রেডিমেড' কেনা নয়। টেরিকটের সার্ট প্যাণ্ট পরে ঝকঝকে দামী আমেরিকান সিগারেট কেস থেকে সিগারেট বের করে লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরায় এখন শম্ভুদা, সিগারেট টানার ধরণটা

অবধি বদলে ফেলেছে। বাসে ট্রামে তো আর চড়েই না, সদাই ঘোরে ট্যাকসিতে। ছোট একটা গাড়ী কিনব ভাবছি, বলেছিল কয়েকমাস আগে।

তারপর শম্ভুদার আর দেখাই পায়নি মানসী। ব্যস্ত, বড় ব্যস্ত আজকাল শম্ভুদা। বুঝলে না। প্রোডিউসার মানুষ এখন, কত যে কাজ চতুর্দ্দিকে। আমার বাবা খেটে প্রোডিউসার হওয়া, গায়ে খেটে প্রোডিউসার হয়েছি, বাপের পয়সায় নয়।

মানসার মুখে এসেছিল, খাটুনি দিয়ে না মেয়ে দিয়ে, কিন্তু মুখ ফুটে সেকথা বলেনি মানসী, বলতে পারেনি। শম্ভুদাকে এমন কঠিন কথা মানসী বলতে পারেনা। শম্ভুদা নিজের প্রয়োজনে আর তো আসে না মানসীদের বাড়ী, মানসীই নিজের দরকারে ডেকে পাঠায়। বস্তুতঃ টাকার দরকার পড়লেই শম্ভুদাকে টেলিফোন করতে হয়। শম্ভুদা এসে ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ দিয়েই যায়। একশ টাকা পর্যন্ত দিয়ে গেছে সেদিন। একটা টনিকও দিয়ে গেছে। বড় রোগা হয়ে গ্যাছ মানি, খাবার পর এটা খেও দু'বেলা। শম্ভুদার কথাটা শুনে হঠাৎ চোখে জল এসে গিয়েছিল মানসীর। এভাবে মানসীর জন্য ভাববার যত্ন করবার এখনও কেউ আছে নাকি? বাবার সঙ্গে তর্ক করত মানসী, চেঁচামিচি করত, কিন্তু বাবাই আবার বলতো, একি চোখের কোণে কালি ক্যান! রাতে ঘুম হয়নি বুঝি? তারপরই কোথা থেকে পয়সা যোগাড় করে এক শিশি কবিরাজী সুগন্ধ তেল এনে দিল। রাত্রে শোবার আগে ব্রহ্মতালুতে মেখে শুলে ঘুম হবে ভাল। দুধ খেতো আগে শুধু খোকন, বাবাই জোর করে মানসীর জন্যও দুধের কার্ড করিয়েছিল একটা। মনে পড়ে, আজকাল বড় বেশী করে বাবার কথা মনে পড়ে মানসীর। বেচারা বাবা। কষ্টই পেয়ে গেল শুধু, মনে পড়ে খারাপ লাগে, খুব খারাপ লাগে মানসীর। টাকার জন্য কত চেঁচামিচি করেছে বাবার সঙ্গে। বালিশের তলায় টাকা লুকিয়ে রেখে বলেছে নেই টাকা। পারবোনা দিতে আর। আর বাবার সেই ভয়

পাওয়া চোখ, ভীতু ভীতু গলা, আর পাঁচটা টাকা দে রে মানি। আবার বকতো, সেই নীচু ঠাণ্ডা স্বর, আবার ঠাণ্ডা লাগাইলি। ওঃ তোরে নিয়ে আর পারা যায়না। নিজেই মিছরি, তেজপাতা দিয়ে গরম জলের পাঁচন তৈরী করে এনে ধরতো মানসীর মুখের সামনে, খেয়ে নে গরম গরম। গায়ের ওপর কাপড়টা টেনে দিত ভাল করে, নিজের গায়ের ছেঁড়া আলোয়ান দিয়ে মেয়ের পিঠ ঢেকে দিত। ঠাণ্ডা লাগাস নাতো।

শম্ভুদার গলায় সেদিন যেন বাবার স্বর শুনতে পেয়েছিল মানসী। মানসীকে আজ পর্য্যন্ত কোন ব্যাপারে কখনও না বলেনি ও। কিন্তু আর কি পারবে? আর কি পকেটে হাত দিয়ে যা ওঠে তাই মানসীর হাত ভরে দিয়ে যেতে পারবে শম্ভুদা?

মানসী জানে হবে না। মানসী বোঝে সে যে হঠাৎ বড়লোক শম্ভুদার চেয়েও অনেক দূরের মানুষ হবে নব বিবাহিত শম্ভুদা। বি-বা-হ শব্দটা বড় সুন্দর। জয়ন্তীও বিবাহিত হয়ে চলে গেল স্বামীর সঙ্গে। আবার বলেছিল জয়ন্তী, এই। করে ফেলনা ইন্দ্রদাকে বিয়ে।

ভাগ্। আমায় বিয়ে করবে কেন তোর ইন্দ্রদা? তুই জানিসনা কি অবস্থা আমাদের? কোথায় থাকি আর কি করে পেট চলে আমাদের।

জানি জানি, ইন্দ্রদাও জানে। আরে তোকে একটা অফিস ক্লাবে অভিনয় করতে দেখেই তো ইন্দ্রদা একেবারে যাকে বলে হাবুডুবু।

বাজে বকিসনা।

বাজে নয় রে, সত্যি। তুই একবার রাজী হয়ে দ্যাখ। যাব তোদের বাড়ী? বলব গিয়ে মাসীমাকে।

না, না, না। পাগল নাকি!

কেন, পাগলামির কি আছে এতে?

তুই আমার সব কথা জানিস না জয়ন্তী। খুব শান্ত প্রায় বিরস সুর মানসীর। আরো অনেক ব্যাপার আছে।

থাকুক। সে নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছেনা। ইন্দ্রদা একদম অন্য outlook-এর লোক—

যতই হোক।

জয়ন্তী মানসীর ডান হাতটা নিজের দুই মুঠিতে চেপে ধরল, শোন, তুই আমার ছোটবেলার বন্ধু, জানিনা আমি তোকে···। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, অনেক কথা কানে আসে আমাদের, তোর অনেক বদনাম আছে, যা ইন্দ্রদাও জানে।

জানিস তোরা, জানিস সব।

কিছু কিছু লোক আছে না, গায়ে পড়ে এসে বাজে কথা শুনিয়ে যায়, কিন্তু মিথ্যে দুর্নামে কি আসে যায়—

সব যদি মিথ্যে না হয়। এবার আর বিষণ্ণ নয়, কেমন অদ্ভুত কঠিন কণ্ঠ মানসীর, সব যদি মিথ্যে না হয়। এক দু মুহূর্ত চুপ করে বোধহয় কিছু ভেবে নিল জয়ন্তী, তারপর সহসাই একটু জোরের সঙ্গে বলে উঠল, হোক, হোক কিছু এসে যায়না তাতে, তোকে আমরা জানি মানসী। আর ইন্দ্রদা যে কি মানুষ। তাছাড়া ওতো ষ্টেটসে চলে যাচ্ছে। সেখানে কে তোর অতীত নিয়ে মাথা ঘামাবে বল? ছাড়িসনা মানসী। মানসীকে একেবারে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো জয়ন্তী, মানসী! এ সুযোগ ছাড়িসনা তুই। একটু প্র্যাকটিকাল হ!

নিশ্চয়, প্র্যাকটিকাল তো হতেই চায় মানসী। আর সেইজন্যই তো এত পরিশ্রম, এত যন্ত্রণা, এত ছলা কলা।

তুই তো জানিস, মানসী শুনতে পেল জয়ন্তী বলছে আমি ভালবাসতুম আমাদের ক্লাসের পল্লবকে। কিন্তু বিয়ের সময় বাবার ঠিক করা পাত্রকেই বিয়ে করছি।

সে তো জানি।

কারণ প্র্যাকটিক্যাল হতে হবে। বাঁচতে হবে তো।

হু।

ভেবে ছাখ মানসী, বাড়ী গিয়ে ভাল করে ভেবে আমায় এসে মতামত জানা। আমি তো এখন আরোও তিন চারদিন আছি। ইন্দ্রদাও বলেছে।

কি বলেছেন?

বলেছে, ভাল করে ভেবে দেখতে বলিস, আমি লোকটা কিন্তু খারাপ নাই, আর পাত্র হিসেবেও নেহাৎ মন্দ নই। হো হো করে হাসল জয়ন্তী, মানসী চুপ করে চেয়ে থাকল জয়ন্তীর দিকে।

কি ভাবছিস, এই। চোখের জল মোছ; নিজের রুমালটা এগিয়ে দিল মানসীর দিকে। প্যান প্যান করে না কেঁদে একটু বুদ্ধি দিয়ে ভেবে দেখতো ডোণ্ট মিস দিস বাস। তারপর ঝরঝর করে ইংরিজিতে অনেক কথা বলে গেল জয়ন্তী, যার বিন্দু বিসর্গ মানসীর বোধগম্য হলনা, তবে প্রথম কথাটার মানে বুঝেছে মানসী, এই ধরনের কথাই জয়ন্তীর মুখে শুনে। ডোণ্ট মিস দিস বাস। আসলে লাষ্ট বাস বলতে চেয়েছে জয়ন্তী। ডোণ্ট মিস দি লাষ্ট বাস। হ্যাঁ এই অবেলায় ঘোলা জলের পাঁকে যখন ডুবে যাচ্ছে মানসী, তখন এই বাসটায় যদি উঠে পড়তে পারে তবে একলাফে একেবারে সেই জীবন —যে জীবনের স্বপ্ন মানসীর চোখের পাতায়, রাতের ঘুমে, দিনের বিরক্তিকর ব্যস্ততার মধ্যেও।

লাষ্ট বাস। সন্দেহ কি এই শেষ আর এই বোধহয় প্রথম মানসীর জীবনে মুক্তির ডাক। আর ভয়ে ভয়ে বেঁচে থাকা নয়, নয় অনুক্ষণ টাকার চিন্তায় ঘোরা, একে তাকে টেলিফোন আর এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা, সব শেষ মুক্তি। মানসীর স্বাধীনতা। একটি মাত্র ছোট হ্যাঁ শব্দ। তারপরই বদলে যাবে, দ্রুত বদলে যাবে সব কিছু। কোথায় থাকবে পড়ে এই বড়লোকের ভাঙা বাড়ী, বোসদা, অফিস ক্লাব, আন্টি আর শম্ভুদা। মানসী ঘুরবে, প্লেনে করেই পাড়ি

দেবে মহা সাগর, যাবে নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন আরো কত কত জায়গায় যাদের নাম মানসী জানেনা এখনও।

কিন্তু মা, রাখী, খোকন, ওদের কি হবে? শম্ভুদা, বোসদা, আন্টির বাড়ীর মত ওরাও যে থাকবে এখানে পড়ে। অবশ্য মানসীও আজ কাল বেশী কিছু আর করতে পারছে না ওদের জন্যও। তবুও কিছু করেই। ধার করে, দু'একটা বিজ্ঞাপনের মডলিং করে এখানে ওখানে বসে থেকেও দু'বেলার অন্ন তো এখনও মানসীই আনছে যোগাড় করে। তবে? এদের সবাইকে নিয়ে তো যাবেনা ইন্দ্রনীল ষ্টেটসে। না, সে শুধু বলেছিল এ্যালবার্ট। সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে থাকব। জানতো এ্যালবার্ট মানসী তার মা বাবা ভাই বোনকে ভাসিয়ে দিয়ে একা একা সুখী হতে পারবেনা। এ্যালবার্ট জানতো চিনতো মানসীকে, কারণ এ্যালবার্ট ভালবাসতো মানসীকে, হ্যাঁ এ্যালবার্ট ভালবেসেছিল মানসীকে, প্রেমে পড়েছিল।

আর ইন্দ্রনীল তো ভাল করে চেনেই না মানসীকে, ভালবাসবে কি করে? মানসীকে ওর ভাল লাগে। কিন্তু ভাললাগা তো নয় ভাল বাসা। ভাল তো ইন্দ্রনীলকে মানসীর লাগে, কিন্তু ভালবাসা? ঝরঝর করে জল গড়িয়ে এল মানসীর দু'চোখ দিয়ে, মনে পড়ল সেই গড়ের মাঠে হাত ধরে পাশাপাশি হাঁটা, সেই যখন প্রথম এ্যালবার্ট ওকে দু'হাতে টেনে নিয়েছিল বুকে, আর তার উত্তপ্ত চুম্বনে ওর সমস্ত শিরায় শিরায় আগুন জ্বলে উঠেছিল, অনেক পাখীর গান আর অনেক ঝরণার জল উছলে উঠেছিল বুকের মধ্যে। আর কষ্টের মত, যন্ত্রণার মত কি এক আশ্চর্য আনন্দের অনুভূতি—আর তারপর সেই দশদিন অবিরত এ্যালবার্টের প্রতীক্ষায় থাকা, যে কোন পায়ের শব্দে চমকে ওঠা, আর বারবার করে আয়নায় মুখ দেখা, চুল খুলে ফেলে আবার চুল বাঁধা, নখে রং লাগান আর গুণগুণ গান, এসেছে প্রেম এসেছে আজ কি মহা সমারোহে। সে কি উৎসব ওর দেহ মনে।

কিন্তু এসব মনে রাখতে চায়না মানসী। সে অধ্যায় তো শেষ, কবেই

বন্ধ গেছে সেই সুখের ঘরের দরজা। জীবনে একবার, মাত্র দশদিনের জন্য সেই অতুল ঐশ্বর্য্যের ছড়াছড়ি, সেই মণি-মুক্তা হীর র ঝলকানি ক্ষণে ক্ষণে। তারপর বাতি নিভে গেছে, আবার সেই নিকষ গাঢ় অন্ধকার, সেই ভয়, সেই বন্দীত্ব। ছটফট করে উঠলো মানসী। জয়ন্তীর কথা মেনে নেবে। একটি মাত্র শব্দ হ্যাঁ বলা মাত্রই বদলে ফেলবে জীবন? মুক্তি পাবে এই দশা থেকে?

তবে কেন সেই আশ্চর্য পাখীগুলো আবার গান গাইছেনা? রঙে রঙে আকাশ ভরে যাচ্ছেনা কেন? কেন? কেন? কেন? বালিশে মুখ ঘষে ঘষে নিজের কাছে নিজেই বারবার প্রশ্ন করল মানসী, আর চোখের জলে বালিশ ভিজিয়ে খালি কাঁদল, এ্যালবার্ট, এ্যালবার্ট।

আজ এই মধ্য রাতে হঠাৎ মনে হল মানসীর প্রায় দু'বছর এমন কিছু বেশী সময় নয়, এ্যালবার্টের জন্য ও দুশ বছর, দু'হাজার বছরও অপেক্ষা করতে পারে! কিন্তু এ্যালবার্টের জায়গায় আর কেউ নয়, আর কিছু নয়। তার চেয়ে এই বন্দীদশা ভাল, হয়ত আন্টির বাড়ীও যেতে হবে, কিন্তু এইখানে একটু থামে, একটু ভাবে মানসী, এ্যালবার্ট কি ক্ষমা করবে কখনও, মেনে নেবে এতবড় অপরাধ। আর ও যে আসবে তাও তো বলেনি। তবে? তবুও, তবুও। না, না, জয়ন্তীর কথা মেনে নিয়ে প্র্যাকটিক্যাল হতে পারছে না মানসী। হে ঈশ্বর। কী করলে জয়ন্তীর মত প্র্যাকটিক্যাল হয়ে একজনকে ভাল বেসে আর একজনকে বিয়ে করা যায়, বলে দাও, বলে দাও। মানসী মেঘে ভরা জমাট কালো আকাশের দিকে চেয়ে আকুল হয়ে শুধুই কাঁদল, আর কাঁদল।

এখন ঘর নিরন্ধ্র অন্ধকার।

সন্ধ্যাবেলা মানসী আজকাল সব সময়ই চুপচাপ শুয়ে থাকে বিছানায়, উঠতে ইচ্ছা করেনা, চোখ জ্বালা করে বলে ঘরে আলো জ্বালেনা।

দূরের সাদা বাড়ীর আলো দেখা যায় একতলা ঘরের খোলা জানলা

দিয়ে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে মানসীর মনে হয় জাহাজের আলো, অন্ধকার নীল সমুদ্রে ভেসে চলা মস্তবড় এক জাহাজ। যেন ঐ বাড়িটা রাতের অন্ধকারে সাদা পাল তুলে মন্থর গতিতে ভেসে চলে নিরুদ্দেশে নিশ্চিন্তে। কূল তার জানা, অন্ধকার সমুদ্রে আলো জ্বালিয়ে ভেসে চলেছে সে ধীরে, কারণ পাড়ের ঠিকানা তার আছে।

সেই শক্ত জমি, সেই কঠিন মাটির ওপর আলোময় এক জগত— এই পাল তোলা জাহাজবাড়ী, পারেনা মানসীকে পৌঁছিয়ে দিতে সেখানে, যেখানে শ্রান্ত নাবিকের মত মানসী পৌঁছবে সেই উত্তপ্ত শয্যায়, যেখানে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে সপ্রেম আলিঙ্গন আর চিন্তাহীন অন্ন।

ছোটবেলার মত আর তার হারিয়ে যেতে ইচ্ছা করেনা, নিরুদ্দেশ জেদী হবার বাসনাও আর নেই, এখন ওর দিবারাত্রের প্রার্থনা নোঙর ফেলার, যে কোন আঘাটায় নয়, শক্ত বাঁধান ঘাট চাই তার, চাই সরল সোজা পরিচিত সিঁড়ি।

ঝনঝন করে দরজার শিকল বেজে উঠল, মার উদ্বিগ্ন স্বর ভেসে এল, খুকী। খুকী। এই সন্ধাকালেই ঘুমাইছিস নাকি? ও খুকী।

নিঃশব্দেই উঠলো মানসী, আলো না জ্বেলেই দরজা খুলে সরে দাঁড়াল। কি চাই।

মা দরজার বাইরে থেকেই মুখ বাড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করল অন্ধকার ঘরের ভেতর, কে আছে ঘরে?

মার ইঙ্গিত পূর্ণ প্রশ্নে আজ আর রাগ হোলনা মানসীর, চিৎকার করে মাকে বাজে বকতে বারণ করতেও পারলনা, শুধু অন্ধকারে ওর পাণ্ডুর ঠোঁটের ফাঁকে সাদা হাসির ম্লান আলো দেখা গেল। মানসী খুব নীচু সুরে বলল, কেউ তো নেই মা। আর তো আমার ঘরে কেউ আসেনা।

না, না, তা কই নাই। মা যেন একটু অপ্রস্তুত। শুয়ে ক্যান?

জ্বর আইছে নাকি আবার। হাত বাড়িয়ে মা মানসীর কপালে হাত দিল, গলায় হাত রাখল।

হুঃ। জ্বর তো আসেই। বেশী না, কিন্তু আসে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো মার। কতদিন ধইর‍্যা তো এই সন্ধ্যাকালে এই ঘুষ ঘুষ জ্বর তোর। ডাকতার দেখাইতে বল শম্ভুরে, শ্যাষ ম্যাষ খারাপ অসুখে না দাঁড়ায়।

না, এমনি সর্দ্দিজ্বর, সেরে যাবে।

কি জানি, সারলেই ভাল।

যেতে গিয়েও মা থামলো, যে জন্য আইছিলাম। একটা চিঠি আছে তর।

চিঠি! মানসীকে আবার এত পুরু খামে কে চিঠি লিখবে? আমার চিঠি! হাত বাড়িয়ে খামটা নিল মানসী, মা চলে গেল।

দরজা বন্ধ করতেও আর ইচ্ছা হল না মানসীর। জানে, মা আবার নানা ছুতোয় ঘরে আসবে, অন্ধকারেই বালিশের নীচে, তাকের ওপর পাতা কাগজের তলায় হাত বোলাবে টাকার সন্ধানে। জেগে থেকেও ঘুমের ভান করে নিঃশব্দে শুয়ে থাকতে হবে মানসীকে। তাই দরজা খুলে রেখেই মানসী আবার এসে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

জানলা দিয়ে সেই আকাশ ছোঁয়া বাড়ীর দিকে দেখল মানসী, সেই জীর্ণ বিস্তৃত প্রাসাদের জানালায় আলো, মস্ত বড় তারার মত জ্বলছে।

কিন্তু কতক্ষণইবা শুয়ে থাকতে পারে মানসী? মা বারবার আসে ঘরে, কি রে খুকী? আজও কি বাইরাবি না? শরীল খারাপ আজও? উত্তর দিতেও ক্লান্তি লাগে মানসীর, তবু কথা বলে—হাসে। বলে না, ততকিছু খারাপ তো নয়, আর দুদিন শুয়ে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে। আজও মা কপাল ছুয়ে গায়ে হাত দিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে গেল। মার অনুমান হয়ত মিথ্যাও নয়। জ্বর তো মানসীর রোজ বিকেল থেকেই আসে। আজও মাথাটা বড় বেশী ভার ভার লাগছে, জ্বরটা বোধহয় আজ বেশী। শম্ভুদা আসবে বলে খবর পাঠিয়েছিল; আসল

নাতো। কাল যে ডাক্তারের কাছে একবার যেতে হবে, ওষুধ আনতে হবে। টাকা কই ?

তু'আঙ্গুল দিয়ে কপালটা একবার ছুঁল মানসী। জ্বরটা বেড়েছে বলেই মনে হয়। নিজের জ্বর কি নিজে বোঝা যায়! হাত তো গরম হয়েই আছে। কি যেন। বড় অস্থির লাগছে আজকে। আরে। হঠাৎ মনে পড়লো মানসীর চিঠি এসেছে না একটা। খামের চিঠি। কে দিল। কষ্টে বিছানা থেকে উঠল মানসী, আলোর সুইচে হাত দিল, আর তখনই দপদপ করে সব আলো নিভে গেল। আজ রাতের মধ্যে চিঠিটা বোধহয় আর পড়া হবেনা। মনে পড়লো, শম্ভুদা সেদিন ভারী সুন্দর লম্বা বড় বড় গোলাপি মোমবাতি দিয়ে গেছে কয়েকটা। বিছানার পাশের তাকেই আছে। বালিশের তলা থেকে দেশলাই বের করে বাতি জ্বালল মানসী। বাঃ। কি সুন্দর ঠাণ্ডা নরম আলো। আস্তে আস্তে খামটা ছিঁড়ল মানসী। কে দেবে এমন ভারী খামে চিঠি মানসীকে। জয়ন্তী বোধহয়। হাসি পায়, তুঃখ হয়। ওকি মানসীর বিয়ে দেবার ইচ্ছা এখনও ছাড়েনি নাকি ?

শক্ত মোটা খাম থেকে মোটা পাতা টেনে বার করে মানসী অবাক হয়ে গেল। পোর্ট ব্লেয়ার,' আন্দামান, বাতির কম আলোয় ভুল দেখছে নাকি ? আন্দামান থেকে কে চিঠি দেবে মানসীকে ? মানসীর তুর্বল হাত বড় বেশী কাঁপছে, ঠিক মতো পড়তে পারবে কি বাতির এই সামান্য আলোয়। পাতাটা টেনে সোজা করল মানসী, পড়ল—আমার মানসী, জানিনা তুমি এখনও আমার আছ কিনা, যদি না থাক, যদি বিয়ে করে থাক, তাহলে এ চিঠি আর পড়ার দরকার নেই, এই পর্য্যন্ত পড়েই ছিঁড়ে ফেলো। আর যদি তুমি এখনও অন্য কাউকে না ভালবেসে থাক, বিয়ে না করে থাক, তবে শোন, আমি মুক্ত হয়েছি এখন, আমি স্বাধীন। এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল আমার আরো তুজন সহকর্মীর সঙ্গে। সব কথা দেখা হলে শুনো,

শুধু জেনে রাখ প্রায় ইচ্ছা করেই ধরা দিয়েছিলাম, প্রায়শ্চিত্ত করেছি আমার লোভের, আমার পাপের। নির্দ্দিষ্ট সময়ের দু'মাস আগে ছাড়া পেয়ে এখানে এসেছি কাজের খোঁজে। কাজ পেয়েওছি। সামান্য কাজ, সামান্য মাইনে, কিন্তু আমাদের চলে যাবে। মানসী, এই দু'বছর প্রতিদিন, প্রতিরাত শুধু তোমার মুখ মনে করেই বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে জাগিয়ে রেখেছি। মানসী। আর আমার মনে কোন গ্লানি নেই, কারাবাসের দণ্ড মাথা পেতে নিয়েছি তোমার সামনে সুস্থ হয়ে দাঁড়াবার জন্য। আমার মানসী, আমি তোমায় ভালবাসি। এক মাস পরেই দেখা হবে। এ্যালবার্ট।

বুঝতে পারছে না মানসী, লেখাগুলো সব ওলট-পালট হয়ে কানের কাছে চিৎকার করছে কেন? এ্যালবার্টের সইটা সত্যি তো? জাল নয়, মিথ্যা নয়, স্বপ্ন নয় এ চিঠিটা? ভালবাসি, আমি তোমায় ভালবাসি কে বলছে? কিসেব প্রায়শ্চিত্ত এ্যালবার্ট? পাপ করল মানসী, আর প্রায়শ্চিত্ত করবে তুমি? তুমি তো জানো না, জানো না কি করেছে মানসী এই দু'বছরে, কি হয়ে গেছে। কড়াৎ বাজ পড়ল নাকি কোথাও, মাথার মধ্যে একি যন্ত্রণা, বুকে একি সুখ। সুখ না ভয়? বুঝতে পারছে না, মানসী কিছুই বুঝতে পারছে না। মাথার শিরাগুলো বড় বেশী দাপাদাপি করছে, জ্বরটা কি বাড়ল আবার। ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিল মানসী, চিঠিটা বুকে চেপে শুয়ে পড়লো বিছানায়। বড় অস্থির লাগছে, এক গ্লাস জল পেলে এখন বড় ভাল হোত। এ-ক-মা-স। বড় বেশী সময় যে এ্যালবার্ট। বেশী দেরী হয়ে যাবে নাকি? কতদিন, কত ঘণ্টায় একমাস হয়? অনেক, অনেক সময়, দেরী হয়ে যাবে, মানসী জানে দেরী হয়ে যাবে।

খুট করে আওয়াজ হোল আবার। চোখে এসে পড়ল তির্য্যক একটি আলোর রেখা। না ঘরে নয়, বাইরে মার হাতে দুলছে শম্ভুদার দেওয়া হ্যারিকেন।

পা টিপে টিপে মানসীর পাশ দিয়ে রেশমী শাড়ীর খসখসে আওয়াজ তুলে কে যেন চলে গেল না? পরিচিত সুগন্ধ একটা। এসেস অফ রোজেস। কতদিন আগে যেন জ্যোৎস্নাদি দিয়েছিলেন। বড় প্রিয় ছিল গন্ধটা মানসীর। সেই গন্ধ এতদিন পরে আজ এখানে?

জ্বর বিজড়িত চোখ কষ্টে খুলে চাইল মানসী। ছোট খুকী রাখী না? নাকি মানসী নিজেই বাইরের ঘরে আলোর তলায় দাঁড়িয়ে আছে। সেই ভয় ভয় ভাল লাগা, সেই লজ্জা লজ্জা ভাব, সেই নিটোল সুন্দর মুখ, সেই টলমলে যৌবন।

বেশী রাইত হয়না য্যান ঝণ্টু। দেইখ্যো

না না, আমাদের রিহার্সাল নটার ভেতর শেষ। এস রাখী। ঝণ্টুদা স্বচ্ছন্দে ছোট খুকির হাত ধরে বেরিয়ে গেল।

দরজার পাল্লায় হাত রেখে মা দাঁড়িয়ে আছে, মার দুর্গা দুর্গা শোনা যাচ্ছে এখান থেকেও। মানসী চোখ খুলে বাইরে তাকাল। বড় সাদা বাড়িটার জানালায় জানালায় তারার মত আলোগুলো নিভে গেল কেন? বড় যে অন্ধকার।

মানসী জানলা দিয়ে আবার দেখল আকাশ, নীল সন্ধ্যা তারাটা বড় বেশী জ্বল জ্বল করছে, আর ঐ কি ধ্রুবতারা? নিষ্কম্প, নিবাত।

—:—